ভারতবর্ষের শাসন পদ্ধতি

চক্রবর্তী ও রায়

ভারতবর্ষের শাসন পদ্ধতি

ভারতবর্ষের শাসন পদ্ধতি

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্য
অনুমোদিত)

শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী, এম্. এ.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক

এবং

শ্রীনরেশচন্দ্র রায়, এম্. এ., পি-এইচ্. ডি.

কলিকাতা সিটি কলেজের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক

ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক

প্রণীত

ম্যাক্‌মিলান এণ্ড কোম্পানি লিমিটেড্

২৯৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট্, কলিকাতা

১৯৪১

প্রথম সংস্করণ, ১৯৩৭

পুনর্মুদ্রিত, ১৯৩৮, ১৯৪০, ১৯৪১

PRINTED BY C. A. PARKHURST AT THE I. S. S. D. PRESS,
95 CHITTARANJAN AVENUE,
OPPOSITE MEDICAL COLLEGE HOSPITAL, CALCUTTA.

ভূমিকা

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নূতন নিয়ম অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বৎসর হইতে পরীক্ষার্থিগণ যে-সকল অতিরিক্ত বিষয় গ্রহণ করিতে পারিবে ভারতের শাসনতন্ত্র তাহাদের অন্যতম। এই বিষয়টি অতি বিরাট এবং জটিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু শাসনতন্ত্রের যে-সকল বিষয় এবং অধ্যায়গুলি উল্লেখ করিয়া এই সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করিতে হইবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাহা বিশেষভাবে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। আমরা এই নির্ধারণ অনুসারেই বর্তমান পুস্তকখানি রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। শাসনতন্ত্রের সাধারণ বিষয়গুলি সহজভাবে এবং অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদিগের উপযোগী করিয়া বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। আইনের জটিল সমস্যাগুলি লইয়া এই পুস্তকে বাদানুবাদ করা আমরা সমীচীন মনে করি নাই। সেইরূপ শাসনকার্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের অবতারণা করিয়া পুস্তকের দৈর্ঘ্য বাড়াইতেও আমরা প্রয়াস পাই নাই। ভারতের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে পরীক্ষার্থীদিগের যাহাতে মোটামুটিভাবে ধারণা জন্মে পুস্তকখানিতে সেই চেষ্টাই করিয়াছি। এ বিষয়ে কতটা কৃতকার্য হইয়াছি তাহার বিচার শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীগণ করিবেন।

শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী
শ্রীনরেশচন্দ্র রায়

সূচীপত্র

ভারতবর্ষের শাসন পদ্ধতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ

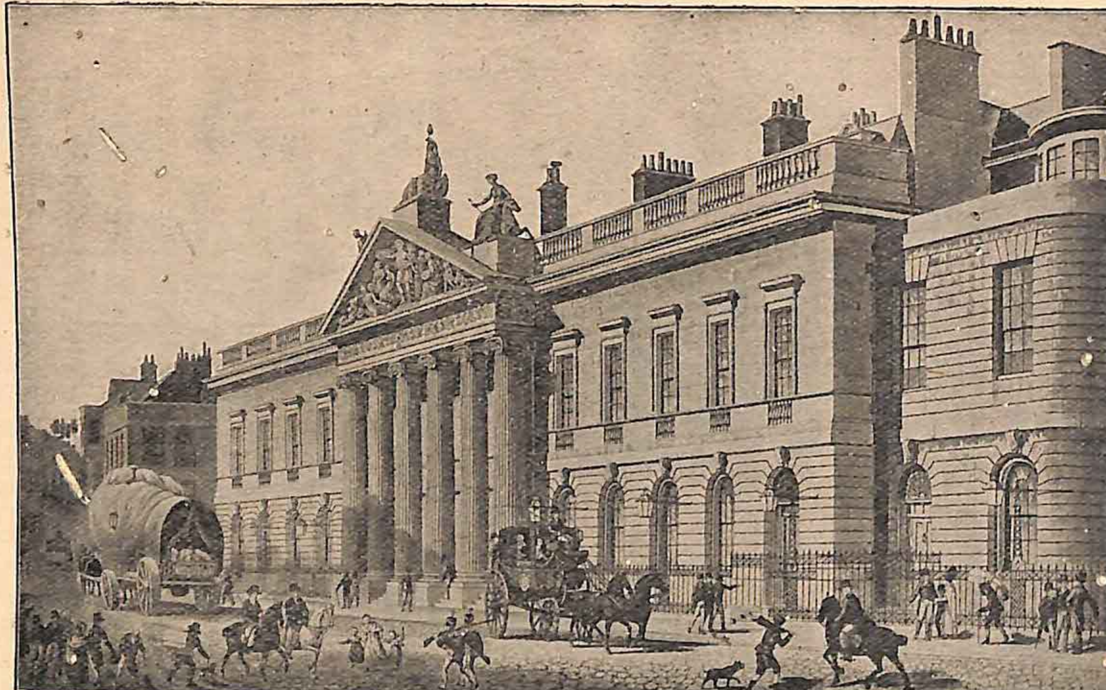
(১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)

ইংলণ্ডে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠন, ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ—ষোড়শ শতাব্দীর শেষ বৎসরে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ কতিপয় সওদাগরকে লণ্ডন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপন করিবার অনুমতি প্রদান করেন। এই সনন্দ অনুসারে কোম্পানি ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। ইহার প্রায় এক শত বৎসর পরে ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় উইলিয়মের রাজত্বকালে ইংলিশ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামক অপর একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। অল্প কিছুদিন ধরিয়া এই দুই কোম্পানির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিবাদ চলিতে থাকে। অবশেষে ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড গডল্‌ফিন্‌ মধ্যস্থ হইয়া দুই কোম্পানি এক করিয়া ইউনাইটেড ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভিত্তি স্থাপন করিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হইলে কোম্পানি ক্রমশ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে লাগিল। লণ্ডনের লিডেন্‌ হল্‌ স্ট্রীটে কোম্পানির প্রধান কার্যালয় স্থাপিত ছিল। ইহার কার্য সুচারুরূপে চালাইবার জন্য অংশীদারগণ মধ্যে মধ্যে একত্রিত হইতেন।

তাঁহাদের এই সম্মিলনকে **হাউস্ অব্ প্রোপ্রাইটর্স্** (House of Proprietors) বলা হইত। কোম্পানির কর্তৃত্ব তাঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল, কিন্তু অংশীদারদের সংখ্যা অধিক হওয়ায় বৎসরে দুই তিন বারের বেশি তাঁহাদের সম্মিলিত হওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং সারা বৎসর কোম্পানির কাজ চালাইবার জন্য ২৪ জন ডাইরেক্টর মনোনীত করা হইত। এই ডাইরেক্টরগণের সভাকেই **কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর্স্** (Court of Directors) বলা হইত।

কোম্পানির বাণিজ্যকেন্দ্রের বিস্তৃতি ও রাজ্যলাভ— ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই দেশের নানা স্থানে কুঠী স্থাপন করেন। বোম্বাই নগরী কোম্পানির প্রথম বাণিজ্য-কেন্দ্র। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের যৌতুক হিসাবে তিনি বোম্বাইএর কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। চার্লস্ এই নগরী নিজ হস্তে না রাখিয়া ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদান করেন। কোম্পানি বোম্বাইএর নিকটবর্তী পশ্চিম উপকূলে আরও দুই চারিটি বাণিজ্য-স্থান নির্দিষ্ট করেন। কিছুদিন পরে পূর্ব উপকূলে মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে কোম্পানির সওদাগরগণ কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ঐ অঞ্চলে বাণিজ্য আরম্ভ করেন। বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ প্রদেশে কোম্পানির কার্য কিছুদিন চলিবার পর ইঁহারা বাংলার দিকে দৃষ্টি দিলেন এবং কলিকাতা নগরী স্থাপন করিলেন। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ অঞ্চলে যেমন প্রধান কেন্দ্রের অধীনে ছোট ছোট কতকগুলি কুঠী পরি-চালিত হইত, সেইরূপ বাংলাদেশে কলিকাতার অধীনে কাশিমবাজার, পাটনা প্রভৃতি স্থানে ইংরেজ বণিকেরা কোম্পানির ব্যবসা চালাইতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয় (১৭০৭ খ্রীঃ)। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতেই মুঘল সাম্রাজ্যে ঘোর অরাজকতা



ইণ্ডিয়া হাউস, লণ্ডন

দেখা দেয় এবং ভারতের সর্বত্র শাসনব্যাপারে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। সাম্রাজ্যের কর্মচারিগণ যে যেভাবে পারিল নিজেদের ক্ষমতার বিস্তার ও স্বার্থের পুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হইল। এই অবস্থায় বিদেশী বণিকেরাও, যাহাতে নিজেদের বাণিজ্য অধিকার হস্তান্তরিত না হয় বরং তাঁহাদের বাণিজ্যের উন্নতি ও ক্ষমতার বৃদ্ধি হয়, সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এখন রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং তাঁহাদের অনেকে কলম ফেলিয়া বন্দুক চালনায় পারদর্শিতা দেখাইতে লাগিলেন। দেশে বাণিজ্যের অধিকার তাঁহারা দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। এখন দিল্লীর প্রভাব লুপ্ত হওয়ায় প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ নিজ নিজ প্রদেশে স্ব স্ব অধিকার স্থাপন করিতে সচেষ্ট হইলেন। এই নূতন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে বিদেশীয় বণিকেরা বাণিজ্য করিবার অধিকার রীতিমত পাইবেন কিনা তাহার স্থিরতা ছিল না। উপরন্তু ইংরেজ এবং ফরাসী বণিকদিগের মধ্যে বিশেষ রকম কলহ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান ছিল। সুতরাং ইংরেজগণ বদ্ধপরিকর হইয়া রাজনীতি এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যোগদান করিলেন। একদিকে তাঁহারা ফরাসীদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের শত্রুতার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপশম করিলেন; অপর দিকে দেশীয় নবাবদিগের উপর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইলেন। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব সিরাজদ্দৌলা তাঁহাদের একজন বিশেষ শত্রু ছিলেন। অতএব পলাশীর যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের শুভানুধ্যায়ী ও অনুগত মীর জাফরকে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসাইলেন। কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যেই মীর জাফরের প্রতি ইংরেজ বণিকদের বিদ্বেষ দেখা দিল। তাঁহারা এই নবাবকে সরাইয়া তাঁহার জামাতা মীর কাশিমকে মসনদে বসাইলেন। মীর কাশিমের সঙ্গে কিন্তু ইংরেজদের স্বার্থ এবং মনের মিল হইল না। শীঘ্রই বিবাদ ঘনাইয়া

আসিল। আবার তিন বৎসর কাটিবার পূর্বেই এই নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজগণ যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মীর কাশিম পলাতক হইয়া অযোধ্যার নবাবের রাজ্যে উপস্থিত হইলেন এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। এদিকে বৃদ্ধ মীর জাফরকে আবার মুর্শিদাবাদের মসনদ প্রদান করা হইল। মীর কাশিম কিন্তু অযোধ্যায় নিশ্চেষ্ট রহিলেন না ; ঐ প্রদেশের নবাবের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাঁহার সৈন্যবাহিনী সঙ্গে লইয়া বাংলার দিকে অগ্রসর হইলেন। বক্সারের নিকট ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে ইংরেজগণ জয়ী হইলেন। মীর কাশিমের চেষ্টা ব্যর্থ হইল এবং তিনি পলাইয়া নিরুদ্দেশ হইলেন।

দেওয়ানী লাভ, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ—এইরূপ বারবার নবাব বদল এবং যুদ্ধবিগ্রহের ফলে বাংলার আর্থিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল। পলাশীর যুদ্ধের কিছুদিন পর ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ ইংলণ্ডে চলিয়া গিয়াছিলেন। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ বাংলার অবস্থা জানিতে পারিয়া চিন্তাকুল হইলেন। কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর্স্ লর্ড ক্লাইভকে ডাকিয়া বাংলার গভর্নরের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। ক্লাইভ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আগমন করেন। তখন মীর কাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হইয়াছে ; এদিকে মীর জাফরের মৃত্যু হইয়াছে এবং তাঁহার এক অপদার্থ পুত্র বাংলার নবাবের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ক্লাইভ অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি করিলেন এবং শীঘ্রই বাংলা প্রদেশের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দূর করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে, নবাবের উপর ইংরেজদের প্রকৃতপক্ষে যতই কর্তৃত্ব থাকুক না কেন, লোকের চক্ষে তাঁহারা বণিক মাত্র। শাসন করিবার ন্যায়ত অধিকার তাঁহাদের কিছুই নাই। এই অধিকার একমাত্র দিল্লীর বাদশাহ্ই তাঁহাদিগকে দান করিতে পারেন। অতএব যাহাতে

ইংরেজের রাজত্ব করিবার অধিকার সম্বন্ধে লোকের মনে কোন প্রকার দ্বিধা না থাকে, সেই অভিপ্রায়ে ক্লাইভ দিল্লীশ্বরের নিকট বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীর জন্য আবেদন করিলেন।

মুঘল রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশকে সুবা বলা হইত। প্রতি সুবায় দুইজন করিয়া উচ্চ কর্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন। একজনের নাম ছিল সুবাদার এবং অপরকে বলা হইত দেওয়ান। একের উপরে অপরের কর্তৃত্ব খাটিত না। উভয়কেই নিযুক্ত করিতেন স্বয়ং সম্রাট, এবং তাঁহাদিগের কার্যের সমালোচনা এবং তাঁহাদিগকে কার্যচ্যুত করিতে পারিতেন একমাত্র তিনিই। সুবাদার আইন এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার কর্তৃত্বাধীনেই সমস্ত ফৌজদারী কার্য সম্পন্ন হইত। দেওয়ান রাজস্ব আদায় করিতে এবং অন্যান্য দেওয়ানী কার্য করিতে নিযুক্ত থাকিতেন। উভয়ের কার্যতালিকা বিশেষভাবে পৃথক্ ছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের পতন হইলে প্রাদেশিক নবাবগণ সুবাদার এবং দেওয়ান উভয়ের কর্মভারই গ্রহণ করিলেন, এবং এইরূপে এক হস্তে দুই কার্য ন্যস্ত হইল।

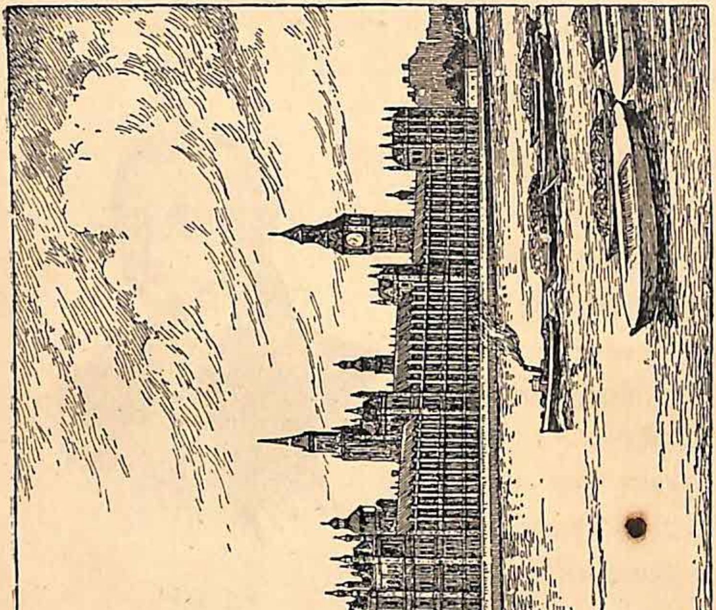
ক্লাইভ ঠিক করিলেন যে, নিজামৎ বা আইন, শৃঙ্খলা প্রভৃতি কার্যাবলী নবাবের হস্তেই ন্যস্ত থাকিবে, কিন্তু রাজস্ব আদায় প্রভৃতি দেওয়ানের কার্য নিজেদের হস্তে লইতে হইবে। দিল্লীর বাদশাহের এই সময়ে দুর্দশার অন্ত ছিল না। দূর প্রদেশগুলির উপর তাঁহার ক্ষমতা অনেক দিনই লুপ্ত হইয়াছিল। এখন দিল্লী হইতেও তিনি বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু সর্বস্বহারা হইলেও আইনত প্রাদেশিক রাজ্য-শাসনভার অর্পণ করিবার অধিকার তাঁহারই ছিল। ক্লাইভ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে যুদ্ধে এলাহাবাদ এবং কোরা প্রদেশ ইংরেজগণ দখল করিয়াছিলেন। এই দুই জেলা

সম্রাটকে প্রদান করা হইল; আরও ঠিক হইল যে, প্রতি বৎসর ইংরেজ সরকার বাদশাহকে ২৬ লক্ষ টাকা কর হিসাবে দিবেন। অপর পক্ষে বাদশাহ্ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সমর্পণ করিলেন। ইংরেজ বাংলার দেওয়ান হইলেন, নবাব নাজিম রহিলেন। কিন্তু সাত বৎসর কাল নবাব বা ইংরেজ কেহই নিজেদের কার্য করিলেন না এবং নিজেদের দায়িত্ব ভাল করিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন না। মহম্মদ রেজা খাঁ নায়েব নাজিম নিযুক্ত হইলেন। একদিকে যেমন নিজামতের কার্য তাঁহার উপরেই ন্যস্ত হইল অপর দিকে দেওয়ানী কার্যের ভারও ইংরেজগণ তাঁহার উপরেই সমর্পণ করিলেন।



লর্ড ক্লাইভ

এই সাত বৎসর রেজা খাঁর কর্তৃত্বের ফলে দেশের অরাজকতা আরও বাড়িয়া গেল এবং আর্থিক অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। নবাব পেন্সনভোগী হইয়া কেবল আমোদপ্রমোদে দিন কাটাইতেন, ইংরেজগণও দায়িত্বভার গ্রহণ না করিয়া কেবল সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। এদিকে ভীষণ দুর্ভিক্ষ এবং মন্বন্তরে দেশ হাহাকারে পূর্ণ হইল। ১৭৬৯ এবং ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেশকে প্রপীড়িত করিল তাহার ফলে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। যাহারা বাঁচিয়া রহিল তাহাদেরও অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া



ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট গৃহ

উঠিল। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার কর্তৃত্ব পরোক্ষভাবে ইংরেজ বণিকদের উপর ন্যস্ত হওয়ায় তাঁহাদের অনেকেই অল্প কালের মধ্যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং রাজার হালে দিন কাটাইতে লাগিলেন। ইহাতে ইংলণ্ডের রাজসরকার স্থির করিলেন, বাংলায় যে ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার লভ্যাংশ শুধু বণিকগণই উপভোগ না করিয়া তাহার কিয়ৎ পরিমাণ সরকারকেও দিতে হইবে। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কয়েক বৎসর এই টাকা বাংলা হইতে লইয়া ইংরেজ গভর্নমেণ্টকে প্রদান করেন। কিন্তু অরাজকতা ও দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলার অবস্থা ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল; এখন কোম্পানি ইংরেজ সরকারকে টাকা দেওয়া দূরে থাকুক নিজেদের বাৎসরিক খরচই সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারিলেন না, এবং ইংরেজ গভর্নমেণ্টের নিকট তাঁহারা কিছু টাকা ধার চাহিলেন। এই টাকা ধার চাহিবার ফলে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট বুঝিলেন যে, কোম্পানি বাংলার শাসনকার্য শৃঙ্খলার সহিত এতদিন চালান নাই এবং সেই জন্যই তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছে। কাজেই এখন স্থির হইল যে আর বিলম্ব না করিয়া এমন একটি আইন প্রণয়ন করিতে হইবে, যাহার অনুবর্তী হইয়া কোম্পানি বাংলার শাসনকার্য সুশৃঙ্খল ভাবে চালাইতে পারেন।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট, ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ—১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এই আইন পার্লামেণ্ট গ্রহণ করিলেন। লর্ড নর্থ তখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী। তাঁহার নাম অনুসারে এই আইনকে **লর্ড নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্ট** (Lord North's Regulating Act) বলা হয়। এ পর্যন্ত কলিকাতা, মান্দ্রাজ এবং বোম্বাইতে কোম্পানির যে তিনটি প্রতিষ্ঠান ছিল তাহাদের কোনটি অপরটির অধীন ছিল না। বস্তুত একটির সহিত আর একটির

সম্পর্কও বিশেষ ছিল না। তিনটিই নিজেদের মত লণ্ডনের কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর্‌স্-এর উপদেশ অনুসারে কোম্পানির কার্য চালাইত। যতদিন ইংরেজগণ মাত্র ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন ততদিন এই ব্যবস্থা মন্দ ছিল না। কিন্তু এখন রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় নূতন ব্যবস্থার প্রয়োজন উপস্থিত হইল।



লর্ড নর্থ

রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে স্থির হইল যে, বাংলাদেশের শাসনকার্য একজন গভর্নর জেনারেল এবং একটি কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত থাকিবে। কাউন্সিলের সভ্য হইবেন গভর্নর জেনারেল স্বয়ং এবং আর চারিজন

সদস্য। সেইরূপ মাদ্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশে শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন একজন করিয়া গভর্নর ও একটি কাউন্সিল। সাধারণত বোম্বাই এবং মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষগণ নিজেদের ইচ্ছামত এবং কোর্ট অব ডাইরেক্টর্‌স্‌-এর উপদেশমত কার্য করিবেন, বাংলা সরকারের অধীন থাকিবেন না। কিন্তু অর্থনৈতিক ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাঁহাদিগকে বাংলা কাউন্সিলের উপদেশ এবং অনুমতি লইয়া কার্য করিতে হইবে। দেশীয় কোন রাজসরকারের সহিত সন্ধি বা বিগ্রহ করিবার পূর্বে স-কাউন্সিল বাংলার গভর্নর জেনারেলের অনুমতি তাঁহাদিগকে লইতে হইবে। অবশ্য যদি এই ব্যাপারে তাঁহারা কোর্ট অব্‌ ডাইরেক্টর্‌স্‌-এর নিকট হইতে কোন বিশেষ আদেশ পাইয়া থাকেন তাহা হইলে বাংলার সরকারের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই সন্ধি বিগ্রহে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। এই শেষোক্ত শর্তটি রেগুলেটিং অ্যাক্টের একটি ত্রুটি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইহার সুযোগ লইয়া প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষগণ পরে কলিকাতার সরকারের অনুমতি না লইয়াই যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাহাতে কোম্পানিকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল।



ওআরেন হেস্টিংস্‌

বাংলায় একজন গভর্নর জেনারেল এবং অপর দুই প্রদেশে একজন করিয়া গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে

তাঁহাদের নিজেদের কোনই ক্ষমতা ছিল না। সমস্ত কার্য তাঁহাদিগকে কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুসারে করিতে হইত। তাঁহারা এই কাউন্সিলের অধিবেশন কালে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। কোনও বিষয়ের সিদ্ধান্তের সময় অপর সদস্যদিগের ন্যায় তাঁহারা একটি করিয়া ভোট দিতে পারিতেন, এবং যখন কোনও সিদ্ধান্তের পক্ষে এবং বিপক্ষে



সার্ ইলায়জা ইম্পে

সমান ভোট হইত তখন একটি 'কাস্টিং ভোট' (casting vote) দিতে পারিতেন। কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের সহিত তাঁহাদের গভীর মতানৈক্য হইলেও তাঁহারা কিছু করিতে পারিতেন না; সেই সিদ্ধান্ত অনুসারেই তাঁহাদিগকে চলিতে হইত। এই নিয়ম রেগুলেটিং অ্যাক্টের অপর একটি বিশেষ ত্রুটি।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে কলিকাতায় একটি সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে একজন প্রধান বিচারপতি ও তিনজন সাধারণ বিচারপতি নিযুক্ত হন। ইংলণ্ডে পাঁচ বৎসরের উপর কার্য করিয়াছেন এই প্রকার অভিজ্ঞ ব্যারিস্টারগণের মধ্য হইতে এই বিচারকগণ নিযুক্ত হইতেন। বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল হইলেন ওআরেন হেস্টিংস্ আর সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি হইলেন সার্ ইলায়জা ইম্পে।

পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ—রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে দশ বৎসর শাসন কার্য চলিবার পর আইনের কতকগুলি পরিবর্তন করা প্রয়োজন বলিয়া মনে হইল। কাজেই ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট এদেশের কোম্পানির শাসন নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য অপর একটি আইন প্রণয়ন করেন। তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী উইলিয়ম পিটের নাম অনুসারে এই আইনকে **পিট্‌স্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট** (Pitt's India Act) বলা হয়।



উইলিয়ম পিট্

এ পর্যন্ত লণ্ডনে এমন কোন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই যাহা দ্বারা ইংরেজ সরকার কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর্‌স্ এবং ভারতীয় শাসনতন্ত্রের উপর দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাদের কার্য়াবলী বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিতেন। এখন ঠিক হইল, ইংরেজ গভর্নমেণ্ট ছয়জন কমিশনার নিযুক্ত করিয়া একটি বোর্ড সংগঠিত করিবেন। এই বোর্ড সাধারণত বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল (Board of Control) নামে পরিচিত হইয়াছিল। বস্তুত বোর্ড ছিল নামে মাত্র। বোর্ডের সমস্ত কার্য ইহার সভাপতিকেই করিতে হইত। ভারতবর্ষে

কোম্পানির সমুদয় শাসনকার্যের উপর এই বোর্ডের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। এখন হইতে নিয়ম হইল ইংলণ্ডে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ যে-সমস্ত আদেশ এবং উপদেশ ভারতবর্ষে তাঁহাদের প্রতিনিধিগণের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং যে-সমস্ত চিঠিপত্র তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত হইবেন, সেই সকলের নকল বোর্ডের নিকট তাঁহাদিগকে পেশ করিতে হইবে। আরও স্থির হইল, বোর্ড ইচ্ছামত ডাইরেক্টরদিগের আদেশ এবং উপদেশ পরিবর্তন করিয়া দিতে পারিবেন এবং ইচ্ছামত তাঁহাদিগকে নূতন আদেশ প্রেরণ করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন। পিট্‌স্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট অনুসারে বাংলার কাউন্সিলের কিছু পরিবর্তন হইল। গভর্নর জেনারেল ব্যতিরেকে চারিজনের স্থানে এখন সদস্য সংখ্যা তিন হইল, এবং এই তিনজনের একজনের পদে কোম্পানির সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবেন এইরূপ নিয়ম হইল। কাউন্সিলের উপর গভর্নর জেনারেলের কর্তৃত্ব আপাতত বৃদ্ধি পাইল না। কিন্তু দুই বৎসর পরে যখন লর্ড কর্নওআলিস এই পদে নিযুক্ত হইলেন তখন তিনি অধিক কর্তৃত্বের দাবী করিয়া বসিলেন। পার্লামেণ্ট তখন পিট্‌স্ আইনের কিছু পরিবর্তন করিয়া নূতন ক্ষমতা গভর্নর জেনারেলকে প্রদান করিলেন (১৭৮৬ খ্রীঃ)। এখন হইতে নিয়ম হইল যে, বিশেষ প্রয়োজন মনে করিলে গভর্নর জেনারেল তাঁহার কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া নিজের মতানুসারে চলিতে পারিবেন। রেগুলেটিং অ্যাক্টের একটি প্রধান ত্রুটি এইভাবে দূরীকৃত হইল। অপর একটি ত্রুটি পিট্‌স্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্টই দূর করিয়াছিল। এই আইন অনুসারে ঠিক হইয়াছিল যে, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ সরকারকে দেশীয় কোন রাজসরকারের সহিত কথাবার্তা চালাইতে হইলে অথবা রাজস্বের এবং সৈন্যসামন্তের ব্যবস্থা করিতে হইলে তাঁহাদিগকে বাংলার সরকারের অধীন হইয়া চলিতে হইবে।

কোম্পানির নূতন সনন্দ, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ ও ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ— ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে বাণিজ্য এবং শাসন করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন পার্লামেণ্টের নিকট হইতে। এই অধিকার তাঁহাদিগকে চিরদিনের জন্য দান করা হয় নাই। কয়েক বৎসর পর পর এই অধিকার লাভ করিবার জন্য পার্লামেণ্টের নিকট তাঁহাদিগকে উপস্থিত হইতে হইত। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদের এক সনন্দের মেয়াদ শেষ হয়। ইংরেজ সরকার তখন ফরাসী দেশের বিপ্লবীদিগের সহিত যুদ্ধে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। কোম্পানির আর্থিক ব্যাপারেও তখন কোন গোলযোগ ছিল না। সুতরাং পার্লামেণ্ট বিশেষ দ্বিরুক্তি না করিয়া কুড়ি বৎসরের জন্য বাণিজ্য এবং রাজত্ব করিবার আর একটি সনন্দ কোম্পানিকে প্রদান করেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে এই সনন্দের মেয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্বেই পার্লামেণ্ট আবার এই বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। এইবার কিন্তু কোম্পানিকে সনন্দ পাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল। কোম্পানির আর্থিক অবস্থা কিছুদিন হইতে খারাপ চলিতেছিল এবং এই বিষয়ে কোম্পানি পার্লামেণ্টের নিকট সাহায্যপ্রার্থী ছিলেন। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে হাউস্ অব্ কমন্স-এর একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি প্রায় চারিবৎসর বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ভারতীয় রাজস্ব ও শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে এক বিস্তারিত বিবরণ (report) পেশ করেন। ইহাই ইতিহাসে 'ফিফ্‌থ্ রিপোর্ট' নামে বিশেষ পরিচিত। এই সময় ইংরেজ জাতির সহিত ফ্রান্সের সম্রাট্ প্রসিদ্ধ নেপোলিয়ন বোনাপার্টির ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছিল। ইউরোপের কোন বন্দরে ইংরেজ বণিকদের কোন জাহাজ পণ্য লইয়া উপস্থিত হইতে পারিত না। ইউরোপের বাণিজ্য হইতে ইংরেজগণ তখন একপ্রকার বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় সাধারণ বণিকগণ দাবী করিয়া বসিলেন যে, ভারতবর্ষের

বাণিজ্যে কেবল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকার থাকিলে চলিবে না, তাঁহাদেরও অধিকার থাকা চাই। ইংরেজ সরকার এই দাবী অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট কোম্পানিকে যে সনন্দ প্রদান করিলেন তাহাতে কুড়ি বৎসরের জন্য চীন সাম্রাজ্যে বাণিজ্য করিবার তাঁহাদেরই একমাত্র অধিকার থাকিবে এইরূপ স্থির হইল। আরও স্থির হইল যে, পুনরায় কুড়ি বৎসরের জন্য কোম্পানি ভারতবর্ষে রাজত্ব এবং বাণিজ্য করিতে পারিবেন। কিন্তু এই বাণিজ্যে তাঁহাদের একচ্ছত্র অধিকার থাকিবে না। সাধারণ ইংরেজ বণিকগণও এখন হইতে ভারতবর্ষে নিজেদের জাহাজ লইয়া উপস্থিত হইতে পারিবেন। এই সনন্দের আর একটি শর্ত এই ছিল যে, এখন হইতে কোম্পানিকে ভারতীয়দিগের শিক্ষার জন্য প্রতি বৎসর এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে। অর্থের পরিমাণ অতি সামান্য হইলেও এই বিষয়ে কোম্পানির দৃষ্টি এই প্রথম আকৃষ্ট হইল।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দ—আবার কুড়ি বৎসর কাটিয়া গেল; সনন্দের মেয়াদ ফুরাইল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট কোম্পানির অধিকার সম্বন্ধে নূতন আইন প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। পার্লামেণ্ট এবার কোম্পানির উপর আরও কঠোর হইলেন। যে আইন এখন পাশ করা হইল তাহার ফলে কুড়ি বৎসরের জন্য ভারতবর্ষে কোম্পানির অধিকার বজায় রহিল, কিন্তু এ দেশে কোম্পানি ব্যবসাবাণিজ্য গুটাইয়া ফেলিতে বাধ্য হইলেন। বাণিজ্য এবং রাজত্ব একত্র চলিলে দেশবাসীর মঙ্গলের পথে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইতে দেখা গিয়াছে। কাজেই কোম্পানিকে এবার ব্যবসা বন্ধ করিতে হইল। চীন সাম্রাজ্যে যে একচ্ছত্র অধিকার তাঁহারা বিশ বৎসর পূর্ব্বে পাইয়াছিলেন তাহাও এবার লুপ্ত হইল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের আইন অনুসারে ভারতবর্ষের

শাসনতন্ত্রের অনেক পরিবর্তন হইল। এতদিন সপরিষদ বাংলার গভর্নর জেনারেল অন্যান্য প্রদেশের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। কিন্তু এই কর্তৃত্ব সকল বিষয়ে খাটিত না, কেবল রাজস্ব ও পররাষ্ট্র বিষয়ে ইহা খাটিত। এখন ঠিক হইল, কোম্পানির অধিকৃত যাবতীয় প্রদেশগুলির উপর সমস্ত শাসন ব্যাপারে কর্তৃত্ব করিবার জন্য এক সপরিষদ গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হইবেন। এই গভর্নর জেনারেলের নাম হইবে 'ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল'। আপাতত বাংলা প্রদেশের জন্য নূতন কোনও সপরিষদ গভর্নর নিযুক্ত হইবেন না। ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল ও তাঁহার পরিষদের সভ্যগণই বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। বাংলার গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক প্রথম ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইলেন। এতদিন যে-সমস্ত নিয়মাবলী অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশে শাসনকার্য পরিচালিত হইত সেইগুলি সপরিষদ গভর্নর বা গভর্নর জেনারেল গঠন করিতেন। এখন এই নিয়মাবলী গঠনের উপর প্রাদেশিক কর্তাদিগের কোন অধিকার থাকিল না। আইন করিবার ক্ষমতা একমাত্র ভারতবর্ষের সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের উপর ন্যস্ত হইল। কিন্তু আইন প্রণয়ন করিবার যে অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন তাহা কোম্পানির কর্মচারীদিগের ছিল না। এখন ঠিক হইল যে, গভর্নর জেনারেলের পরিষদে একজন চতুর্থ সদস্য নিযুক্ত হইবেন। কোম্পানির কোন কর্মচারীকে এই সদস্য পদে নিযুক্ত করা হইবে না, এবং নিযুক্ত হইবার পর এই সদস্য কেবল আইন প্রণয়নের সময় পরিষদে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। আইন প্রণয়ন ব্যতিরেকে পরিষদের অন্যান্য শাসনকার্যে তাঁহার কোন অধিকার থাকিবে না এবং কোন মন্তব্য তিনি প্রকাশ করিতে পারিবেন না; কেবল শৃঙ্খলা এবং দক্ষতার সহিত আইন

প্রণয়নের জন্যই তাঁহার নিয়োগের ব্যবস্থা হইল। এই সদস্যের পদে প্রথম নিযুক্ত হইয়াছিলেন ইংলণ্ডের খ্যাতনামা বাগ্মী, ঐতিহাসিক এবং লেখক টমাস্ ব্যাবিংটন্ মেকলে।



লর্ড মেকলে

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের আইন সর্বপ্রথম ভারতীয়দিগের সম্মুখে সরকারী কর্মের দ্বার উন্মুক্ত করে। ইহার ৮৭ ধারায় উল্লিখিত হইয়াছিল যে, কোম্পানির অধিকারভুক্ত প্রদেশসমূহের কোন অধিবাসীকে তাহার জাতি, বর্ণ, ধর্ম, বংশমর্যাদা বা জন্মস্থানের জন্য কোম্পানির কোনও চাকুরী, পদ বা কার্যের জন্য অযোগ্য বিবেচনা করা হইবে না। দেশশাসন-কার্যে ভারতবাসীদের এরূপ অবাধ প্রবেশাধিকার ইতিপূর্বে কখনও এত উদারতার সহিত ও এত পরিস্ফুটভাবে স্বীকৃত হয় নাই।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার বা সনন্দ—বিশ বৎসর পরে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এক নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া ভারতে কোম্পানির শাসনতন্ত্রের পুনরায় কিছু পরিবর্তন করেন। এবার কোম্পানিকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভারতের শাসনভার অর্পণ করা হয়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এই দেশে আইন পাশ করিবার যে পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল এবার তাহারও অনেক পরিবর্তন করা হইল। আইন-সদস্য এখন সর্বতোভাবে গভর্নর জেনারেলের কার্যকরী পরিষদের (Executive Council) সভ্য হইলেন। এখন স্থির হইল যে, তিনি যে কেবল আইন সম্বন্ধীয় ব্যাপারেই পরামর্শ দিবেন তাহা নহে, অন্যান্য শাসনকার্যেও অপর সদস্যদিগের ন্যায় তাঁহার ক্ষমতা থাকিবে। গভর্নর জেনারেল এবং তাঁহার পরিষদের কয়েকজন সদস্য মিলিয়া আর আইন বিষয়ে আলোচনা করিতে এবং আইন পাশ করিতে পারিবেন না। এখন হইতে ঠিক হইল যে, এই ব্যাপারের আলোচনার সময় আরও সাতজন ব্যক্তি সদস্যরূপে পরিষদে যোগদান করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ভারতবর্ষের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ, দ্বিতীয়জন কলিকাতার স্থপ্রিম-কোর্টের প্রধান বিচারপতি, তৃতীয়জন ঐ কোর্টের অন্যতম বিচার-পতি, অবশিষ্ট চারিজন হইবেন চারি প্রদেশের (বাংলা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ) প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধিগণ হইবেন কোম্পানির কর্মচারী এবং তাঁহাদিগকে প্রতিনিধি ভাবে নিযুক্ত করিবেন প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট কয়েকটি। এইরূপে এই বৎসর সর্বপ্রথম একটি **ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার** (Legislative Council of India) সৃষ্টি হইল এবং এই ব্যবস্থাপক সভাকে গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদ হইতে স্বতন্ত্র করা হইল। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন ও কার্যবিবরণী এই আইনের বলে সর্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত হয়।

ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীতে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের আইন দ্বারা আরও দুইটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। গভর্নর জেনারেলের শাসনভার লাঘব করিবার জন্য বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার জন্য একজন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর নিযুক্ত হইলেন এবং ভারতীয় সিভিল্ সার্ভিসের দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হইল।

সিপাহীবিদ্রোহ ও ভারতে কোম্পানির রাজত্বের অবসান— এই শাসনতন্ত্র পাঁচ বৎসর চলিবার পূর্বেই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে সিপাহীবিদ্রোহের বহ্নি প্রজ্বলিত হইল। কয়েক মাসের মধ্যে এই বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে ভারতের শাসনকার্যের প্রতি ইংরেজ জাতির দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট বুঝিলেন যে, কোম্পানির হাতে শাসনকার্য ন্যস্ত থাকিলে আর চলিবে না। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এক আইন পাশ করিয়া ভারতের শাসনদণ্ড কোম্পানির হস্ত হইতে রাজহস্তে সমর্পণ করা হইল। কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর্‌স্ ও বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল ভারত শাসন ব্যাপারে যে কর্তৃত্ব করিতেন তাহা এখন সপরিষদ একজন মন্ত্রীকে প্রদান করা হইল। এই মন্ত্রীকেই আমরা ভারতসচিব (Secretary of State for India) বলিয়া জানি।



মহারাণী ভিক্টোরিয়া

গভর্নর জেনারেল এখন ভারতে রাজপ্রতিনিধির আসন লইলেন এবং এখন হইতে **ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল** নামে পরিচিত হইলেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর এক ঘোষণাপত্র (Queen's Proclamation) দ্বারা রাণী ভিক্টোরিয়া এই নূতন শাসনপ্রণালী প্রচার করিলেন এবং লর্ড ক্যানিংকে ভারতবর্ষের প্রথম "ভাইস্‌রয় ও গভর্নর জেনারেল" নিযুক্ত করিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের রাজকীয় উপাধি আইনের (Royal Titles Act, 1876) বলে রাণী ভিক্টোরিয়া **ভারত-সম্রাজ্ঞী** (Empress of India) এই উপাধি গ্রহণ করিবার ক্ষমতালাভ করেন এবং পর বৎসর ১লা জানুয়ারী তারিখে রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন এক ঘোষণাপত্র দ্বারা এই বার্তা প্রচার করেন।


লর্ড ক্যানিং

ইণ্ডিয়ান্ কাউন্সিল্‌স্ অ্যাক্ট, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ—১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে যদিও আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা পরিবর্তন করা হয় এবং আইন পরিষদে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশগুলি হইতে প্রতিনিধি প্রেরণ স্থির হয়, তথাপি ইহা উল্লেখযোগ্য যে প্রতিনিধিগণের মধ্যে কেহই ভারতবাসী ছিলেন না। বস্তুত ভারতবাসীদিগের অভাব-অভিযোগ প্রকৃতভাবে জানিবার বিশেষ কোন বন্দোবস্তই ছিল না। সিপাহী-বিদ্রোহের পর অনেক বিবেচক ইংরেজের মতে এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, আইন পরিষদে দুই-চারিজন ভারতীয় থাকিলে গভর্নমেণ্ট এই দেশবাসীর অভাব-অভিযোগের কথা বিশদভাবে জানিতে পারিতেন এবং বিদ্রোহের

সূত্রপাত হইবার পূর্বেই তাহার প্রকৃত কারণগুলি অপনোদন করিতে পারিতেন। এই বিবেচক ইংরেজদিগের অভিমত ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট গ্রহণ করিলেন এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইণ্ডিয়ান্ কাউন্সিল্স্ অ্যাক্ট পাশ করিলেন। আইন পরিষদে কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দুইজন এখন হইতে আর সভ্য থাকিতে পারিলেন না। এই পরিষদে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলিও আর নিজেদের মনোনীত প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিলেন না। এখন হইতে স্থির হইল, আইন প্রণয়ন ব্যাপারে গভর্নর জেনারেল তাঁহার পরিষদের কয়েকজন অতিরিক্ত সভ্য মনোনীত করিতে পারিবেন। ইহাদের সংখ্যা ছয়ের কম হইবে না এবং বারোর বেশি হইবে না। যে কয়জন সভ্য এইরূপে নিযুক্ত হইবেন তাঁহাদের মধ্যে অন্তত অর্ধেক সংখ্যক বেসরকারী সভ্য মনোনীত করিতে হইবে। আরও ঠিক হইল যে, একবার নিযুক্ত হইলে সভ্যগণ দুই বৎসরের জন্য এই পদে আসীন থাকিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য, বেসরকারী যে কয়জন সভ্য এই অ্যাক্ট অনুসারে মনোনীত হইলেন তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন ভারতবর্ষীয়। পাতিয়ালার মহারাজা ও হোলকারের দেওয়ান তাঁহাদের অন্যতম। এই অতিরিক্ত সভ্যগণ গভর্নর জেনারেলের পরিষদে মাত্র আইন প্রণয়ন ব্যাপারেই যোগদান করিতে পারিতেন। আর্থিক এবং রাজস্ব আদায় ব্যাপারে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ করিবার কোনই অধিকার ছিল না; বাজেটের উপর কোন কথা বলিবার তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত উপায় ছিল না; শাসন ব্যাপারে গভর্নমেণ্টকে কোন প্রশ্ন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন না। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের আইনের ২৩ ধারায় ইহাও উল্লিখিত ছিল যে, বিশেষ প্রয়োজন হইলে (in cases of emergency) গভর্নর জেনারেল তাঁহার ব্যবস্থাপক সভার ও শাসন পরিষদের অনুমোদন

ব্যতিরেকেই ছয়মাসের জন্য জরুরী আইন (ordinances) প্রণয়ন করিতে পারিবেন। এই ক্ষমতা অদ্যাবধি গভর্নর জেনারেল ব্যবহার করিতে সক্ষম আছেন।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের অ্যাক্ট অনুসারে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলির আইন করিবার ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের অ্যাক্ট অনুসারে তাঁহাদিগকে আইন প্রণয়ন ব্যাপারে আবার অধিকার প্রদান করা হয়। কোন্ বিষয়ের আইন করিবার অধিকার ভারত গভর্নমেণ্টের এবং কোন্ বিষয়ে আইন করিবার অধিকার প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের, তাহার কোনও সিদ্ধান্ত ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের অ্যাক্টে করা হয় নাই। তবে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টকে কোনও আইন করিবার পূর্বে ঐ বিষয়ে গভর্নর জেনারেলের অনুমতি লইতে হইত। যেরূপে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় কয়েকজন সরকারী ও বেসরকারী অতিরিক্ত সদস্য মনোনীত করা হইত, সেইরূপে প্রদেশগুলিতেও সরকারী ও বেসরকারী কয়েকজন মনোনীত সভ্য লইয়া ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইত। মান্দ্রাজ এবং বোম্বাইতে গভর্নরের পরিষদে অতিরিক্ত সভ্যগণ অবিলম্বেই মনোনীত হইলেন। বাংলায় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে (বর্তমান যুক্তপ্রদেশ) ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং পঞ্জাবে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সভা প্রথম স্থাপিত হয়।

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল্‌স্ অ্যাক্ট, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ—১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল্‌স্ অ্যাক্ট বৃটিশ পার্লামেণ্ট পাশ করেন। ইহাতে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপক সভাগুলির অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এতদিন এই সভাগুলির বেসরকারী সভ্যগণ সকলেই গভর্নমেণ্টের মনোনীত ছিলেন। দেশে এখন শিক্ষাবিস্তার কতক পরিমাণে ব্যাপক হইয়াছিল, রাজ্যশাসন বিষয়েও অনেক লোকের

দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল ; কাজেই দেশবাসীর অনেকে এখন দাবী করিতে লাগিলেন যে, ব্যবস্থাপক সভাগুলির কয়েকজন বেসরকারী সভ্যকে তাঁহারাই মনোনীত করিয়া পাঠাইবেন। ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসভা (Indian National Congress) ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বৎসরের পর বৎসর দাবী করিতেছিলেন যে, ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভাগুলির কতক পরিমাণ সভ্য দেশবাসিগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এই বিষয়ে এক মধ্যপথ অবলম্বন করিলেন। এখন হইতে স্থির হইল, এই সভ্যগণকে দেশবাসীরা প্রথমে মনোনীত করিবেন, কিন্তু এই মনোনয়নের ফলেই সভ্যগণ আইন পরিষদে স্থান পাইবেন না। ভারতীয় এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ এই মনোনয়ন মানিয়া লইলে তাঁহারা সভ্যপদে আসীন হইতে পারিবেন। ইচ্ছা করিলে কর্তৃপক্ষ এই মনোনয়ন বাতিল করিয়া পুনরায় অন্য মনোনয়ন করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহারা কখনও এইরূপ করেন নাই। কাজেই প্রকৃত প্রস্তাবে বলা যাইতে পারে যে, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ইণ্ডিয়ান্ কাউন্সিল্‌স্ অ্যাক্ট অনুসারে সভ্য-নির্বাচন-রীতি এদেশে প্রবর্তিত হয়। এই অ্যাক্ট অনুসারে ব্যবস্থাপক সভাগুলির সভ্যসংখ্যাও কতক পরিমাণে বর্ধিত হয় এবং সভ্যগণ এখন হইতে শাসনকার্য সম্পর্কে গভর্নমেণ্টকে প্রশ্ন করিতে এবং গভর্নমেণ্টের আর্থিক বিবরণের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিতে অধিকারী হন।

মর্লে-মিণ্টো শাসন সংস্কার, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ—১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের অ্যাক্ট অনুসারে ভারতের শাসনকার্য ১৫ বৎসরের কিছু অধিককাল পরিচালনার পর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট তৃতীয় ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল্‌স্ অ্যাক্ট পাশ করেন। সেই সময়ে ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড মিণ্টো এবং লর্ড মর্লে ছিলেন ভারত-

সচিব। এই অ্যাক্টের সহিত উভয়ের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখন যে নূতন শাসন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইল তাহা মর্লে-মিণ্টো শাসন-সংস্কার নামে পরিচিত। তৃতীয় কাউন্সিল্‌স্ অ্যাক্ট পাশ হইবার ফলে প্রথমত ব্যবস্থাপক পরিষদগুলির সভ্যসংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। ভারতীয় পরিষদের সভ্য-সংখ্যা এতদিন ১৬ ছিল, এখন হইল ৬০। বাংলা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশের সভ্যসংখ্যা ৫০ করা হইল। এই সংখ্যাবৃদ্ধিই কিন্তু নূতন সংস্কারের প্রধান বৈশিষ্ট্য নহে। প্রকাশ্য এবং সরলভাবে এইবার সর্বপ্রথম নির্বাচনরীতির প্রবর্তন হইল। প্রতি ব্যবস্থাপক সভা তিন প্রকার সভ্য লইয়া গঠিত হইবে স্থির হইল। একদল হইবেন সরকারী কর্মচারী, তাঁহাদিগকে অবশ্য গভর্নমেণ্ট মনোনয়ন করিবেন। দ্বিতীয় দল বেসরকারী সভ্য, কিন্তু তাঁহারাও গভর্নমেণ্টের মনোনীত। তৃতীয় দল বেসরকারী জননায়ক, তাহারা দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধি। ভারতীয় পরিষদে সরকারী কর্মচারীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকিবেন, কিন্তু প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে মনোনীত এবং নির্বাচিত বেসরকারী সভ্যগণই সংখ্যায় অধিক হইবেন স্থির হইল। বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদে মোট ৫০ জন সভ্যের মধ্যে নির্বাচিত সভ্যগণই সংখ্যায় অধিক হইবেন ইহারও ব্যবস্থা হইল।



লর্ড মিণ্টো

নির্বাচন-রীতি স্থির করিতে গিয়া পার্লামেণ্ট সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সভ্যগণ সাম্প্রদায়িক ভাবে নির্বাচিত হইবেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের মুসলমান নেতাগণ হিজ্ হাইনেস্ আগা খাঁকে মুখপাত্র করিয়া গভর্নর জেনারেলের নিকট উপস্থিত হন এবং সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-রীতির জন্য



লর্ড মর্লে

আবেদন করেন। ভারত-সচিব লর্ড মর্লে প্রথমে এই ব্যাপারে বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁহাকেও পৃথক্ সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের পৃষ্ঠপোষক হইতে হইল। অতএব ১৯০৯ সনের অ্যাক্ট অনুসারে স্থিরীকৃত হইল যে, মুসলমান ও অমুসলমান জনগণের

প্রতিনিধিবৃন্দ পৃথক্‌ভাবে নির্বাচিত হইবেন। নির্বাচন-রীতি প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু সাধারণ জনগণের নির্বাচন ব্যাপারে কোনও হাত রহিল না। মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচনের ভার দেওয়া হইল কয়েকটি মুসলমান প্রতিষ্ঠানের উপর। অন্যান্য সাধারণ প্রতিনিধিগণের নির্বাচন করিবার অধিকার দেওয়া হইল ডিস্ট্রিক্টবোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের অ্যাক্ট অনুসারে পরিষদের সভ্যগণ শাসনকার্য সম্বন্ধে গভর্নমেণ্টকে প্রশ্ন করিতে এবং আয়-ব্যয়ের বিবরণ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা পরিষদে কোন 'রেজোলিউসন' (resolution) উত্থাপন করিতে এবং সে বিষয়ে সভ্যগণের ভোট লইতে পারিতেন না। এবার সেই অধিকার তাঁহারা পাইলেন। এখন হইতে বাজেট এবং অন্যান্য শাসনকার্য পরিচালনা সম্বন্ধে রোজোলিউসন্ উত্থাপন করিয়া এবং তাহার উপর সভ্যগণের ভোট লইয়া মতামত প্রকাশ করিতে তাঁহারা অধিকারী হইলেন। এতদিন পর্যন্ত মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশে শাসনকর্তাদিগের কোনও কার্যকরী পরিষদ (Executive Council) ছিল না। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মর্লে-মিণ্টো আইন অনুসারে বাংলায় অবিলম্বে এই পরিষদ গঠিত হইল। আরও ঠিক হইল যে, অন্যান্য প্রদেশেও এইরূপ পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে, কিন্তু উহা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে পার্লামেণ্টের অনুমতি আবশ্যক হইবে। তারপর এতদিন পর্যন্ত ভারতীয় বা কোনও প্রাদেশিক কার্যকরী পরিষদে ভারতবাসীর স্থান ছিল না। অনেকদিন যাবৎ এদেশের নেতৃবর্গ দাবী করিয়া আসিতেছিলেন যে, এই পরিষদগুলিতে অন্তত একজন করিয়া ভারতবাসীকে নিযুক্ত করা হউক। এইবার ইংরেজ

সরকার এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। দুই বৎসর পূর্বে (১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে) লর্ড মর্লে তাঁহার নিজের পরিষদে দুইজন ভারতবাসীকে



লর্ড সিংহ

(শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ও সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী) নিযুক্ত করেন। এখন স্থির হইল যে, একজন করিয়া ভারতবাসীকে গভর্নর জেনারেলের

ও প্রাদেশিক কার্যকরী পরিষদে নিযুক্ত করা হইবে। বস্তুত অবিলম্বেই ভারতীয় পরিষদে নিযুক্ত হইলেন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (Lord Sinha), এবং বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত কার্যকরী পরিষদে নিযুক্ত হইলেন শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল গোস্বামী।

মর্লে-মিণ্টো শাসনসংস্কার সম্বন্ধে ইহা বিশেষ করিয়া বলা প্রয়োজন যে, ঐ সংস্কার দ্বারা ভারতবর্ষে কোনরূপ দায়িত্বমূলক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই। এমন কি এই শাসনতন্ত্রকে লর্ড মর্লে ও লর্ড মিণ্টো পাশ্চাত্য প্রথার অনুকরণে প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র ("representative government for India in the Western sense of the term") বলিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। লর্ড মর্লে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলেন—"যদি কেহ মনে করেন যে, শাসনসংস্কারের এই অধ্যায় প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষে দায়িত্বমূলক শাসনরীতির (Parliamentary System) প্রবর্তন করিবে তাহা হইলে আমি নিজে ঐরূপ কোন কথার সহিত সংশ্রব রাখিতে ইচ্ছা করি না।"*

* Lord Morley's disclaimer:—"If it could be said that this chapter of reforms led directly or indirectly to the establishment of a parliamentary system in India, I for one, would have nothing at all to do with it."

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার (১৯১৯)

মর্লে-মিণ্টো অ্যাক্ট অনুসারে ভারতের শাসনতন্ত্র কয়েক বৎসর পরিচালিত হইবার পরেই ইউরোপে মহাসমর আরম্ভ হইল। পূর্ব হইতেই রাজনৈতিক আন্দোলন এদেশে তীব্র হইয়া উঠিতেছিল। স্বরাজ্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ ইংরেজ সরকারকে প্রাণপণে সাহায্য করিতে লাগিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বায়ত্তশাসনের দাবীও দেশবাসীর মধ্যে বাড়িয়া উঠিল। যুদ্ধের সময় সর্বত্রই এবং সর্বকালেই সাধারণ জনগণের মধ্যে এক নূতন সাড়া পড়িয়া যায়; সহসা তাহাদের সুপ্ত মনে রাজনৈতিক চৈতন্যের উদয় হয়। ভারতবর্ষেও সাধারণ নরনারীর মনে মহাযুদ্ধের সময় এক নূতন জাগরণ দেখা দিল। ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ না হইলে বোধ হয় মর্লে এবং মিণ্টোর কীর্তি অন্তত ১৫।২০ বৎসর স্থায়ী হইত। কিন্তু যুদ্ধ বাধিবার ফলে শীঘ্রই ইহার পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল।

যে পদ্ধতি অনুসারে এতদিন ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র পরিচালিত হইয়াছিল তাহার সংস্কার যতদূর পর্যন্ত সম্ভব ছিল তাহা মর্লে-মিণ্টো অ্যাক্ট দ্বারা হইয়াছিল। ঐ পদ্ধতির এখন আমূল পরিবর্তন না করিতে পারিলে আর উহার সংস্কার সম্ভবপর ছিল না। এতদিন ভারতীয়গণ ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য মনোনীত বা নির্বাচিত হইতে পারিতেন। কার্যকরী পরিষদেও প্রবেশ করিবার অনুমতি তাঁহারা পাইয়াছিলেন। কিন্তু শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের

হস্তেই ন্যস্ত ছিল। ব্যবস্থাপক সভাগুলি পরামর্শ দিতে পারিতেন, নিজের মত ব্যক্ত করিতে পারিতেন, প্রশ্ন করিয়া শাসনকার্যের বিষয় জানিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহাদের মতানুসারেই গভর্নমেণ্টকে চলিতে হইবে এইরূপ ব্যবস্থা মোটেই প্রবর্তিত ছিল না। সপরিষদ গভর্নর জেনারেল ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের মত অনুসারেই এদেশের শাসনকার্য নিয়ন্ত্রিত করিতেন। তিনি যেরূপে কার্য চালাইতেন তাঁহার জন্য ভারতের ব্যবস্থাপক সভার নিকট তিনি কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য ছিলেন না। একমাত্র ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিকটই তাঁহাকে তাঁহার কার্যকলাপের জন্য জবাব দিতে হইত।

এখন ভারতবাসীদিগের দাবী হইল যে, দেশে প্রকৃতভাবে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইংরেজ সরকার এ বিষয়ে অবিলম্বে কিছু করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিগণকে সর্বপ্রথম সামরিক সাম্রাজ্য মন্ত্রণাসভায় (Imperial War Conference) আহ্বান করা হইল এবং ঐ মন্ত্রণা-সভার এক বিশেষ মন্তব্যে ইহা প্রচার করা হইল যে, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি বিশিষ্ট অংশ এবং সাম্রাজ্যের পররাষ্ট্র ব্যাপার সম্বন্ধে ভারতবর্ষের কথা বলিবার বিশেষ অধিকার আছে। ("India as an important portion of the Imperial Commonwealth having right to an adequate voice in foreign policy and in foreign relations.") তারপর ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অগস্ট ভারত-সচিব মিঃ এড্‌উইন মণ্টেগু (Mr. Edwin Montagu) পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে এক বিবৃতি পাঠ করিলেন। এই বিবৃতি পাঠ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিশেষ এবং চিরস্মরণীয় ঘটনা। মিঃ মণ্টেগু ইহা পাঠকালে ঘোষণা করিলেন যে, এখন

হইতে ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রতি শাখায় এই দেশবাসীদিগকে সংযুক্ত করিয়াই সরকার শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন এবং ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া ধীরে ধীরে এদেশে দায়িত্বমূলক শাসননীতি প্রবর্তন করিবেন। ("The policy of His Majesty's Government with which the Government of India are in complete accord, is that of increasing the associa-



মিঃ এড্‌উইন মণ্টেগু

tion of Indians in every branch of the administration and the gradual development of self-governing institutions with a view to the progressive realisation of responsible government in India as an integral part of the British Empire.")

এই ঘোষণা করিবার কিছুদিন পরেই গভর্নর জেনারেলের আহ্বানে ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু এদেশে আগমন করেন এবং লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের

সহিত একত্র হইয়া নূতন শাসন-সংস্কার বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। মণ্টেগু সাহেব নানা প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া এবং ভারতীয় নেতৃগণের অনেকের সহিত কথোপকথন করিয়া প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া লইলেন, এবং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া সংস্কার বিষয়ে এক বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত করিলেন। এই বিবরণই **মণ্টেগু-চেম্স্‌ফোর্ড রিপোর্ট** নামে প্রসিদ্ধ। এই বিবরণের প্রস্তাবগুলিকে অধিকাংশ স্থলে মূল সূত্র করিয়া ইংরেজ সরকার ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে এক বিল উপস্থিত করেন। ইহা পাশ হইবার পূর্বে কমন্স এবং লর্ড সভার এক মিলিত কমিটির নিকট ইহা দাখিল করা হয়। এই কমিটি অনেক সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজ এবং ভারতীয় মহোদয়গণের সাক্ষ্য লইয়া বিলটিকে নানাস্থানে পরিবর্তিত করেন। এই সংস্কৃত এবং পরিবর্তিত বিল ১৯১৯ সনের ডিসেম্বর মাসে পাশ হইয়া ঐ খ্রীষ্টাব্দের গভর্নমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট (Government of India Act, 1919) নামে পরিচিত হয়।


লর্ড চেম্স্‌ফোর্ড

কথা উঠিয়াছিল **ভারতসচিবের পরিষদ** (Council of India) তুলিয়া দেওয়া হইবে। ভারতবাসীর অনেকের ধারণা জন্মিয়াছিল যে এই পরিষদের বাস্তবিক কোনও প্রয়োজন নাই। ইহার সদস্যগণ সাধারণত

গোঁড়া ও প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা ভারতবর্ষের বিশেষ উপকার সাধিত না হইয়া অনেক সময়ে প্রগতির পথে বিঘ্ন হইত। কিন্তু



সার্ ফিরোজ খাঁ নূন্

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের আইন অনুসারে পরিষদ উঠিয়া গেল না, ইহার সভ্যসংখ্যা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হইল মাত্র। স্থির হইল, এই সংখ্যা ১২র

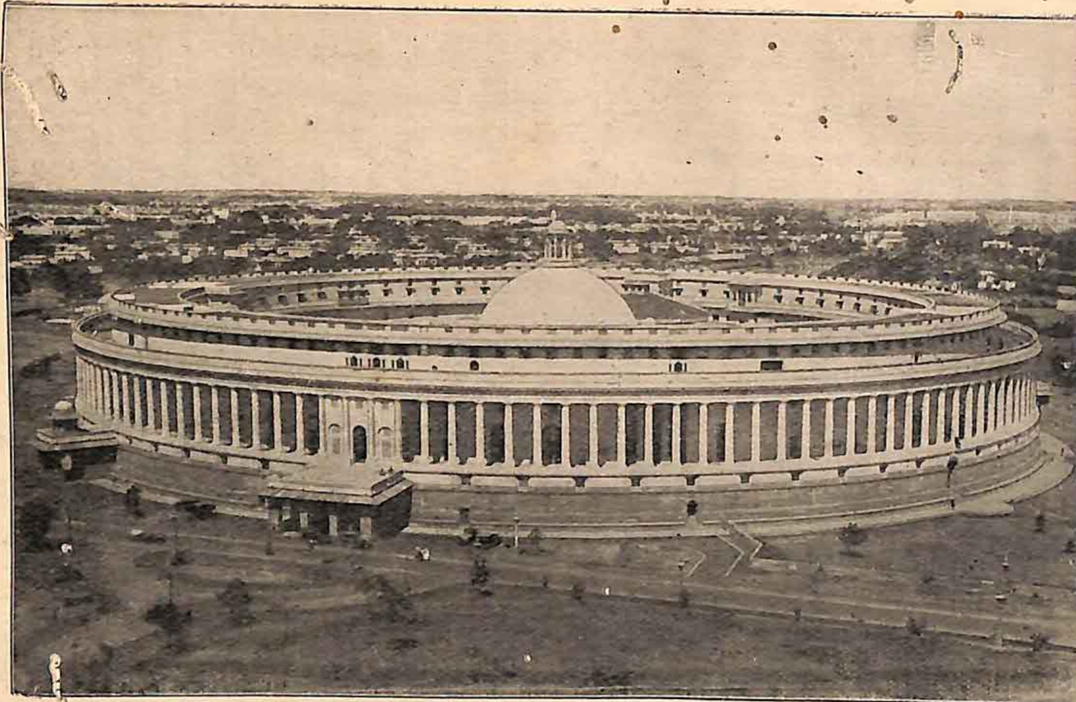
বেশি এবং ৮এর কম হইবে না। প্রতি সদস্য পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন। পূর্বে সপরিষদ ভারতসচিবের ভারতের রাষ্ট্রপরিচালনায় যত অধিক ক্ষমতা ছিল এখন তাহার কিছু ব্যতিক্রম হইল। তারপর এতদিন পর্যন্ত ভারতসচিবই ইংলণ্ডে এদেশের গভর্নমেণ্টের এজেণ্ট হিসাবে অনেক কাজকর্ম করিতেন। নূতন অ্যাক্ট অনুসারে এই সকল কাজ চালাইবার জন্য একজন নূতন কর্মচারী নিযুক্ত হইবেন স্থির হইল। এই কর্মচারীকে **হাই কমিশনার** (High Commissioner) বলা হয়। যে সমস্ত ভারতীয়গণ ইংলণ্ডে শিক্ষার্থী হইয়া গমন করেন তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করা, ভারত-সরকারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ইংলণ্ডে ক্রয় করা, যে সকল ভারতীয় কর্মচারী অবসরপ্রাপ্ত হইয়া বা ছুটি লইয়া ইংলণ্ডে থাকিবেন তাঁহাদের বেতন বা পেন্সন দিবার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি কাজ হাই কমিশনারকে প্রদান করা হইল। বাংলার দুইজন কৃতী সন্তান, সার্ অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সার্ ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র পাঁচ বৎসর করিয়া এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। বর্তমান হাই কমিশনার একজন পাঞ্জাবী ; তাঁহার নাম মালিক সার্ ফিরোজ খাঁ নূন্।

এতদিন পর্যন্ত ভারত শাসনের দায়িত্ব ভারত গভর্নমেণ্টের উপরই ন্যস্ত ছিল। প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলি প্রকৃতপক্ষে ভারত গভর্নমেণ্টের এজেণ্ট হিসাবেই কার্য করিতেন। তাঁহাদিগকে ভারত গভর্নমেণ্ট যে সকল কাজ করিতে বলিতেন তাঁহারা কেবল সেইগুলিই করিতে পারিতেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের অ্যাক্ট অনুসারে এই নিয়মের অনেকখানি ব্যতিক্রম হইল। এইবার ভারত গভর্নমেণ্ট ও প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট-গুলির মধ্যে শাসনকার্য মোটামুটি ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। সামরিক কার্য এবং সমগ্র দেশের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ভারত গভর্নমেণ্টের হাতে রহিল। আমদানি ও রপ্তানির উপর শুল্ক বসাইবার দায়িত্বও এই

গভর্নমেণ্টের উপরই ন্যস্ত করা হইল। অধিকাংশ রেলওয়ের উপর কর্তৃত্ব করিবার অধিকারও ইহাকেই দেওয়া হইল। ইহা ভিন্ন আরও কয়েকটি দায়িত্বপূর্ণ কার্য ভারত গভর্নমেণ্টের তত্ত্বাবধানে রহিল। অপরদিকে স্বায়ত্ত-শাসন, চিকিৎসা-ব্যবস্থা, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন, শিক্ষা-বিস্তার, জেল পরিদর্শন, বিচারকার্যের ব্যবস্থা এবং প্রদেশে শান্তিরক্ষা প্রভৃতি কাজ প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টকে প্রদান করা হইল।

পূর্বের ন্যায় গভর্নর জেনারেল এবং তাঁহার কার্যকরী পরিষদের উপর ভারত গভর্নমেণ্টের শাসনতন্ত্র চালাইবার ভার ন্যস্ত রহিল। এই পরিষদে এতদিন একজন মাত্র ভারতীয় ছিলেন। এখন হইতে তিনজন ভারতীয় সদস্য নিযুক্ত করিবার রীতি প্রবর্তিত হইল। সদস্যগণ তাঁহাদের আপন আপন বিভাগের পরিচালনার জন্য পূর্বের ন্যায় গভর্নর জেনারেল ও ভারতসচিবের নিকট দায়ী রহিলেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের কার্যাবলীর উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না স্থির হইল। বস্তুত, দায়িত্বমূলক শাসননীতি কিয়ৎ পরিমাণেও ভারত গভর্নমেণ্টে প্রবর্তিত হইল না।

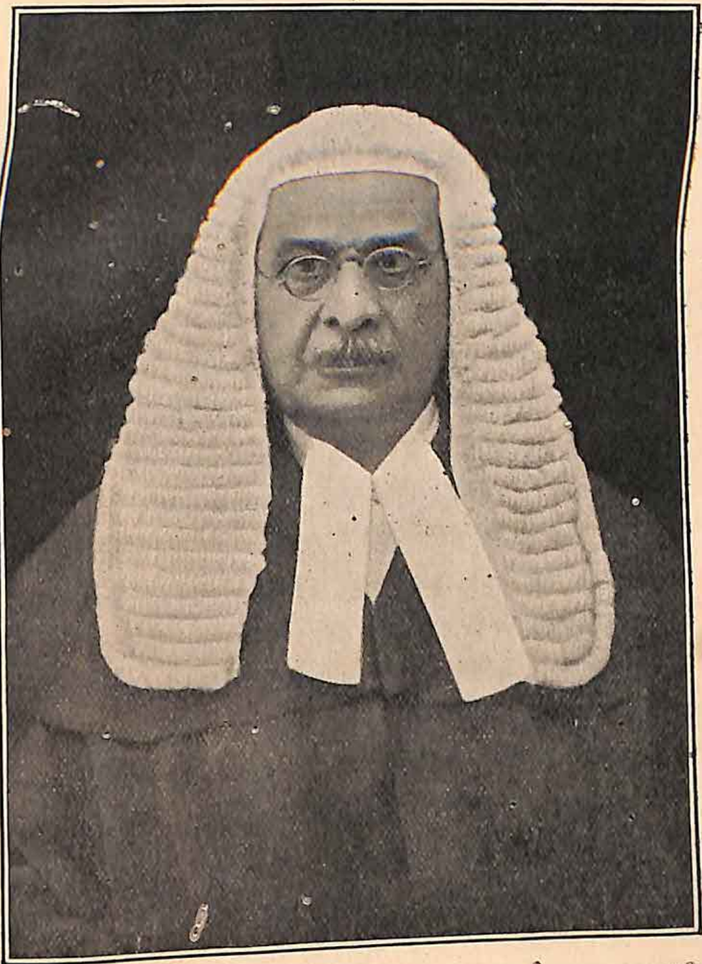
আইন করিবার ব্যবস্থা এখন কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টে পূর্বাপেক্ষা জটিলতর হইল। এই কার্যের জন্য দুইটি আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রথমটির নাম ব্যবস্থাপক সভা; (Legislative Assembly); দ্বিতীয়টির নাম রাষ্ট্রীয় পরিষদ (Council of State)। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যসংখ্যা ১৪৪ হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট হইল। ইহার মধ্যে ১০৩ জন নির্বাচিত হইয়া আসিবেন, আর ৪১ জন গভর্নমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হইবেন। এই ৪১ জন মনোনীত সভ্যগণের মধ্যে ২৬ জন হইবেন সরকারী কর্মচারী আর অবশিষ্ট কয়েকজন বেসরকারী ভদ্রলোকদিগের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন। পূর্বোক্ত ১০৩ জন সভ্য সাম্প্রদায়িকভাবে নির্বাচিত



ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Assembly)—দিল্লী

হইবেন। বস্তুত পৃথক্ এবং সাম্প্রদায়িক নির্বাচন মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কারের একটি মূল সূত্র। প্রদেশগুলিতে হিন্দু, মুসলমান, শিখ ও ইউরোপীয়দিগের পৃথক্ নির্বাচনের জন্য ভোটদাতৃগণের তালিকা প্রস্তুত হইল। যাঁহারা ইন্‌কম ট্যাক্স অথবা অপেক্ষাকৃত অধিক ভূমিকর প্রদান করিবেন তাঁহারাই ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে ভোট দিবার অধিকারী হইলেন। সাধারণত চার পাঁচটি জেলার ভোটারগণকে লইয়া এক একটি 'কন্‌স্‌টিটুয়েন্সি' বা নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা হইল, এবং তাহা হইতে নির্বাচিত হইয়া সভ্যগণ ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হইবেন এইরূপ ব্যবস্থা হইল।

রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভ্যসংখ্যা ৬০ জন। এই ৬০ জনের মধ্যে ৩৪ জন নির্বাচিত এবং ২৬ জন গভর্নমেণ্টের মনোনীত। ২৬ জনের মধ্যে ২০ জন সরকারী এবং ৬ জন বেসরকারী সভ্য। এই পরিষদ গঠনেও পৃথক্ নির্বাচনরীতি সর্বতোভাবে পালনীয়। মুসলমান ও অমুসলমান সভ্যগণ পৃথক্ নির্বাচনমণ্ডলী হইতে প্রেরিত হইয়া পরিষদে আসিবেন। মুসলমান ভোটদাতৃগণ অমুসলমান সভ্যনির্বাচনে অধিকারী হইবেন না। সেই প্রকার অমুসলমান ভোটারগণও মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচনে কোন অধিকার পাইবেন না। মুসলমানদিগের প্রতিনিধি মুসলমান-দিগের মধ্য হইতেই নির্বাচিত হইবেন। অমুসলমানদিগের সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। রাষ্ট্রীয় পরিষদের নির্বাচনে কেবলমাত্র বিশেষ সম্পত্তি ও অর্থশালী জনগণই ভোট দিবার অধিকার পাইলেন। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদিগের বয়স অন্যূন ২৫ বৎসর হওয়া আবশ্যক, কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভ্যদিগের অন্ততঃপক্ষে ৩০ বৎসর বয়স্ক হওয়া প্রয়োজন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের আইন পাশ হইবার পূর্বে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় গভর্নর জেনারেল স্বয়ং সভাপতিত্ব করিতেন। কিন্তু এই আইন



সার্ আবদার রহিম

অনুসারে স্থির হইল ব্যবস্থাপক সভা এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদ উভয়েরই স্বতন্ত্র এবং আপন আপন সভাপতি থাকিবে। প্রথম চারি বৎসর ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করিবেন, কিন্তু এই কয় বৎসর অতিবাহিত হইলে সভা স্বীয় সদস্যদিগের মধ্য হইতে সভাপতি নির্বাচন করিবেন। বর্তমানে সার্ আব্দার রহিম ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি। রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি এখনও গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করেন। সার্ মাণেকজি দাদাভাই এখন এই পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

কোনও আইন প্রণয়ন করিতে হইলে ব্যবস্থাপক সভায় অথবা রাষ্ট্রীয় পরিষদে আইনের খসড়া উপস্থিত করিতে হইবে। তবে খসড়াটি অর্থনৈতিক সংক্রান্ত হইলে উহাকে ব্যবস্থাপক সভাতেই উপস্থিত করা আবশ্যক। খসড়াটি এক সভাতে গৃহীত হইলে উহা অপর সভায় প্রেরিত হইবে এবং দ্বিতীয় সভায় গৃহীত হইবার পর গভর্নর জেনারেলের নিকট উহা পেশ করা হইবে। গভর্নর জেনারেল ঐ খসড়া গ্রহণ করিয়া দস্তখত করিলে ইহা আইনে পরিণত হইবে; তবে সম্রাট ইচ্ছা করিলে এই আইন বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন। বলা হইল যে, উভয় পরিষদে গৃহীত না হইলে কোন খসড়া আইনে পরিণত হইতে পারে না; কিন্তু গভর্নর জেনারেল যদি বিবেচনা করেন যে কোন বিশিষ্ট আইন রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা হইলে ব্যবস্থাপক সভা ঐ আইনের খসড়া অগ্রাহ্য করিলেও তিনি উহা রাষ্ট্রীয় পরিষদে পাঠাইতে পারেন এবং পরে ইহাকে আপনার দস্তখত দিয়া আইনে পরিণত করিতে পারেন। গভর্নর জেনারেল যেমন এইভাবে দেশে আইন সভার অনুমতি না লইয়াই স্থায়ী আইন প্রণয়ন করিতে পারেন, সেইরূপ তিনি আপনার ইচ্ছামত একযোগে

ছয় মাসের জন্য অস্থায়ী আইন (ordinance) প্রণয়ন করিতে পারেন। ছয় মাস অতিবাহিত হইলে আবার ছয় মাসের জন্য এই অস্থায়ী আইন তিনি বহাল রাখিতে পারেন।

গভর্নমেণ্টের রাজস্ব আদায়ের জন্য যে আইনের প্রয়োজন উহার খসড়া প্রথমে ব্যবস্থাপক সভায়, এবং ঐ সভায় গৃহীত হইলে রাষ্ট্রীয় পরিষদে আনয়ন করা হইবে এবং তথায় গৃহীত হইলে গভর্নর জেনারেলের দস্তখত সহ ইহা আইন বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় খসড়াটি অগ্রাহ্য হইলে গভর্নর জেনারেল উহা আবশ্যক বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন এবং সাধারণ আইন প্রণয়নের রীতি অনুসারে উহাকে রাষ্ট্রীয় পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আইনে পরিণত করিতে পারেন। রাজস্ব আদায় ব্যাপারে যেমন ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতা অপ্রতিহত নহে, সেই প্রকার উহার ব্যয় ব্যাপারেও ঐ সভার অধিকার সম্পূর্ণ নহে। প্রথমত কতকগুলি বিভাগে রাজস্ব ব্যয় করিতে হইলে ব্যবস্থাপক সভার অনুমতি মোটেই প্রয়োজন হয় না। উপরন্তু এই সভা এই জাতীয় অর্থব্যয়ের ব্যাপারে কোনও ভোট দিতেই পারেন না। যে সমস্ত বিষয়গুলি "ভোটেব্‌ল্‌" বা ভোটযোগ্য বলিয়া পরিচিত সেইগুলির উপর রাজস্ব ব্যয় করিতে হইলে গভর্নমেণ্টকে ব্যবস্থাপক সভার নিকট অনুমতির জন্য উপস্থিত হইতে হয়। গভর্নমেণ্ট বলেন, "অমুক বিভাগের খরচের জন্য এত টাকা প্রয়োজন"; ব্যবস্থাপক সভা ইচ্ছা করিলে উহার পরিমাণ কমাইয়া দিতে অথবা একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারেন। কিন্তু গভর্নর জেনারেল যদি মনে করেন যে ঐ টাকা রাজ্য পরিচালনার জন্য একান্ত প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি সেইরূপ ঘোষণা করিয়া পূর্বের নির্দিষ্টমত অর্থ ঐ বিভাগে খরচ হইবে বলিয়া আদেশ দিতে পারেন।

আইন সভার সদস্যগণ কেবল যে আইন প্রণয়ন এবং গভর্নমেণ্টের আয়-ব্যয় ব্যাপারেই লিপ্ত থাকেন তাহা নহে। প্রায়শঃই তাঁহারা গভর্নমেণ্টকে নানা বিভাগের শাসনকার্য সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। এই সকল প্রশ্ন করিবার ফলে অনেক সময় শাসনকার্যের বিবিধ গলদ বাহির হইয়া পড়ে এবং সভ্যগণ তাহা জানিয়া গভর্নমেণ্টকে সতর্ক ও সাবধান হইতে বলেন। অনেক সময় গুরুতর বিষয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিবার জন্য এবং গভর্নমেণ্টকে ঐ বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য সদস্যগণ ব্যবস্থাপক সভায় অথবা রাষ্ট্রীয় পরিষদে কোনও রেজোলিউসনের বা মন্তব্যের অবতারণা করিতে পারেন এবং অনেক সময় করিয়াও থাকেন। কোনও বিষয়ে রেজোলিউসন পাশ হইলেই যে গভর্নমেণ্টকে সেই অনুসারে কাজ করিতে হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। তবে ঐ রেজোলিউসনের ধরণ হইতে গভর্নমেণ্ট বুঝিতে পারেন কোন্ দিকে এবং কিভাবে বায়ু বহিতেছে। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং রেজোলিউসন পাশ করা ভিন্ন অপর এক ভাবে সদস্যগণ নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করিতে পারেন। দেশে হঠাৎ কোন গুরুতর ব্যাপার ঘটিলে তাঁহারা সভায় বা পরিষদে "অ্যাড্জোর্নমেণ্ট মোশন্" (adjournment motion) বা মুলতুবী প্রস্তাব আনিতে পারেন। পূর্বের নির্দিষ্ট কার্য বন্ধ রাখিয়া সভাতে এই গুরুতর ব্যাপারের আলোচনা হউক বলিয়া তাঁহারা দাবী করিতে পারেন। এই দাবী গ্রাহ্য হইলে ঐ ব্যাপারে বক্তৃতাদি করিবার পর তাঁহারা ভোট লইতে পারেন।

প্রদেশগুলির মধ্যে পূর্বে কেবল তিনটি প্রদেশের উপর একজন করিয়া গভর্নর নিযুক্ত ছিলেন, বাকীগুলির উপর ছিলেন একজন করিয়া লেফ্টেনাণ্ট গভর্নর অথবা চীফ্ কমিশনার। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড আইন অনুসারে নয়টি প্রদেশের উপর একজন করিয়া গভর্নর নিযুক্ত হইলেন।

কয় বৎসর পরেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকেও গভর্নরের প্রদেশ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছিল। এই দশটি প্রদেশের শাসনতন্ত্রকে সাধারণত "ডায়ার্কি" (dyarchy) নামে অভিহিত করা হইত। যে সকল বিষয়ের শাসনভার প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল সেগুলি দুইভাগে বিভক্ত। পুলিশ, জেলপরিদর্শন, বিচার ব্যবস্থা, জলসেচন প্রভৃতি বিষয় "রক্ষিত" (reserved) বিভাগগুলির অন্তর্গত ছিল। অন্য দিকে স্বায়ত্ত-শাসন, চিকিৎসা ব্যবস্থা, শিক্ষাদান, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি প্রভৃতি বিষয় "হস্তান্তরিত" (transferred) বিভাগগুলির অন্তর্গত ছিল। "রক্ষিত" বিভাগগুলির কার্যভার অর্পণ করা হইয়াছিল গভর্নর এবং তাঁহার কার্যকরী পরিষদের উপর, আর "হস্তান্তরিত" বিভাগগুলি চালাইবার দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছিল গভর্নর ও তাঁহার মন্ত্রিগণের উপর। গভর্নরের কার্যকরী পরিষদের সভ্যগণকে নিযুক্ত করিতেন স্বয়ং ভারতসচিব। গভর্নরের ন্যায় তাঁহারা একযোগে পাঁচ বৎসরের জন্য এই পদে নিযুক্ত হইতেন এবং এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে ব্যবস্থাপক সভা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারিতেন না। বস্তুত তাঁহাদের কার্যকলাপের জন্য তাঁহারা গভর্নর, গভর্নর জেনারেল এবং ভারত-সচিবের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার নিকট তাঁহারা কোনক্রমেই জবাবদিহি করিতে বাধ্য ছিলেন না। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমেয় যে, যে সকল বিভাগের কর্তৃত্ব তাঁহাদের উপর ন্যস্ত ছিল সেগুলি সাধারণত ব্যবস্থাপক সভার ইচ্ছা ও অভিমতের বিরুদ্ধেও পরিচালিত হইতে পারিত। কার্যকরী পরিষদগুলির সদস্য সংখ্যা দুই হইতে চারি ছিল। সাধারণত অর্ধসংখ্যক সদস্য সিভিল সার্ভিস হইতে এবং অবশিষ্ট সদস্যগণ ভারতীয় নেতৃগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইতেন। মন্ত্রিগণের নিয়োগ

গভর্নরের হস্তে ছিল। তিনিই তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবার এবং দরকার হইলে পদচ্যুত করিবার মালিক ছিলেন। ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সভ্যগণের মধ্য হইতে মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত করা হইত। গভর্নর যদি এমন কাহাকেও মন্ত্রী নিযুক্ত করিতেন যিনি নিয়োগকালে ঐ সভার নির্বাচিত সভ্য নহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ছয় মাসের মধ্যে ঐরূপে নির্বাচিত হইতে হইত। নির্বাচিত না হইতে পারিলে মন্ত্রিত্ব হইতে তাঁহাকে অপসারিত হইতে হইত। মন্ত্রিগণের হাতে যে সমস্ত বিভাগের কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকিত তাঁহাদের সেগুলিকে সাধারণত ব্যবস্থাপক সভার ইচ্ছা ও অভিমত অনুসারেই পরিচালিত করিতে হইত। বস্তুত মন্ত্রিগণের ব্যবস্থাপক পরিষদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিবার উপায় ছিল না। এই পরিষদের অধিকাংশ সভ্য মন্ত্রিগণের বিরুদ্ধাচারী হইলে এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্টভাবে অভিমত প্রকাশ করিলে মন্ত্রিগণকে পদত্যাগ করিতে হইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রাদেশিক সরকারের কতকগুলি বিভাগস্থানীয় ব্যবস্থাপক সভার মতানুসারে, আর কতকগুলি বিভাগ ভারতসচিবের মতানুসারে পরিচালিত হইত। এই কারণেই প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রকে দ্বৈত শাসন বা ডায়ার্কি (dyarchy) বলা হইত।

মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড আইন অনুসারে প্রতি প্রদেশে একটি করিয়া ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্ব আমলে প্রাদেশিক শাসন-কর্তারাই ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিত্ব করিতেন। কিন্তু এখন পৃথক্‌ সভাপতির ব্যবস্থা হইল। প্রথম চার বৎসর এই সভাপতিকে গভর্নর নিযুক্ত করিতেন, কিন্তু পরে ব্যবস্থাপক সভা আপন সভ্যদিগের মধ্য হইতে ঐ সভাপতি নির্বাচিত করিতেন। বাংলার ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সভাপতিদিগের মধ্যে সন্তোষের মহারাজা সার্‌ মন্মথনাথ



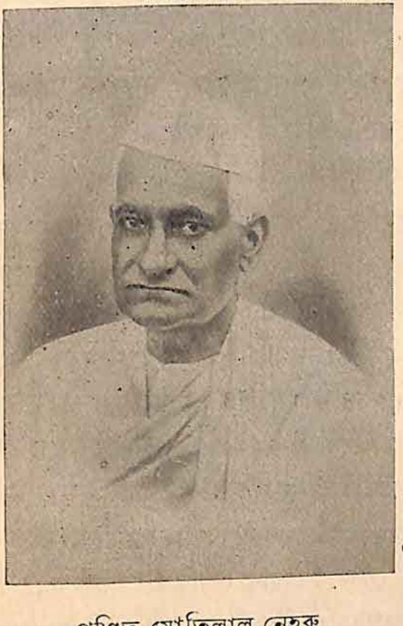
মহারাজা সার্ মন্মথনাথ রায়চৌধুরী

রায়চৌধুরী অন্যতম ছিলেন। সভাগুলির সভ্যসংখ্যা পূর্ব হইতে অনেক পরিবর্ধিত হইল। বাংলা দেশে ব্যবস্থাপক সভায় ১৪০ জন সভ্য থাকিবেন এরূপ স্থির হইল। সভ্যসংখ্যার অন্তত শতকরা ৭০ জন নির্বাচিত হইতেন এবং শতকরা ২০ জনের অধিক সরকারী কর্মচারী হইতে পারিতেন না। সভ্যগণ তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত অথবা মনোনীত হইতেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি পৃথক্‌ভাবে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া সভায় পাঠাইতেন। বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদিগের জন্য ৩৯ জন এবং অমুসলমানদিগের জন্য ৪৬ জন সদস্য নির্দিষ্ট ছিল। মুসলমানদিগের এই নির্দিষ্ট সভ্যসংখ্যা নির্বাচিত করিবার জন্য বাংলার প্রতি জেলায় কেবলমাত্র মুসলমান ভোটার লইয়াই কতকগুলি নির্বাচনমণ্ডলী গঠিত ছিল। অমুসলমান সভ্যগণকে নির্বাচিত করিবার জন্যও এইরূপ ব্যবস্থা হইত। মুসলমান, অমুসলমান, খ্রীষ্টান এবং ইউরোপীয়দিগের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে সভ্য নির্বাচন এই ব্যবস্থাপক সভাগুলি গঠনের এক প্রধান মূলনীতি। নির্বাচনমণ্ডলীগুলি কাহাদের লইয়া গঠিত হইবে সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছিলেন এক ফ্রাঞ্চাইজ কমিটি। লর্ড সাউথবরো (Lord Southborough) এই ফ্রাঞ্চাইজ কমিটির (Franchise Committee) সভাপতি ছিলেন ও পরলোকগত দেশপূজ্য নেতা সার্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। সর্বসাকল্যে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে ব্যবস্থাপক সভাগুলি গঠনের জন্য ৬০ লক্ষ ব্যক্তিকে ভোট দিবার অধিকার প্রদান করা হয়। এই সংখ্যা খুব অধিক নহে। স্ত্রীলোকেরা ভোট দিবার অধিকারী হইবেন কি না এ বিষয়ে পার্লামেণ্ট কোন মীমাংসা না করিয়া বিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভাগুলির উপর মীমাংসা করিবার দায়িত্ব অর্পণ করেন। তদনুসারে ক্রমে ক্রমে সকল প্রদেশেই স্ত্রীলোকদিগকে ভোট দিবার অধিকার দেওয়া হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নূতন ভারত গভর্নমেণ্ট আইনের প্রবর্তন

মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার আইন অনুসারে স্থির ছিল যে, দশ বৎসর ইহা বহাল থাকিবার পর একটি কমিশন বসাইয়া এই আইনের সংস্কার



পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু

ও পরিবর্ধন কতখানি প্রয়োজন তাহার নির্ধারণ করা হইবে। কিন্তু সংস্কৃত শাসনতন্ত্র পরিচালিত হওয়ার প্রথম হইতেই বহু সংখ্যক লোক উহার আমূল পরিবর্তনের জন্য দাবী করিতে লাগিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বর্গীয় পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু পূর্ণ দায়িত্বমূলক গণতন্ত্র অবিলম্বে প্রবর্তনের জন্য এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং উহা ঐ সভায় গৃহীত হয়। এদেশের জনসাধারণ আরও নানা ভাবে দিনের পর দিন বিশদভাবে প্রকাশ করেন যে, ভারতীয়গণ মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কারে মোটেই সন্তুষ্ট নহেন এবং তাঁহারা অবিলম্বে ইহার পরিবর্তন কামনা করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার কমিশন প্রেরণ সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে একটি সংশোধক বিল আনয়ন করেন। উহা পাশ হইবার ফলে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসনতন্ত্র দশবৎসর পরিচালিত হইবার পূর্বেই ইংরেজ গভর্নমেণ্ট ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে কমিশন বসাইতে অধিকারী হইলেন।

সাইমন কমিশন—এই সময়ে লর্ড বার্কেনহেড (Lord Birkenhead) ভারতসচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার মতানুসারে ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা ঠিক করিলেন যে কমিশনের প্রত্যেক সভ্যকেই পার্লামেণ্টের সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত করা হইবে। এই নির্ধারণ অনুসারে লর্ডস্‌ এবং কমন্স সভা হইতে সাতজন সভ্য লইয়া একটি রয়্যাল কমিশন গঠন করা হইল। সার্‌ জন সাইমনের (Sir John Simon) নেতৃত্বাধীনে এই কমিশন শীঘ্রই ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন। প্রায় তিন বৎসর এই দেশের রাষ্ট্র পরিচালনা সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধানের পর কমিশন ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে সম্রাটের নিকট ভবিষ্যৎ শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বিবৃতি উপস্থিত করিলেন। কিন্তু কমিশনের অভিমত অনুসারে ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রের পুনঃসংস্কার অবিলম্বেই সম্ভব হইল না। সাইমন কমিশন নিযুক্ত হইবার সংবাদ ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার বিরুদ্ধে এদেশে এক প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইল। ইহার সকল সদস্যই ইংরেজ ছিলেন বলিয়া

একদল ইহার বিরুদ্ধবাদী হইলেন। সভ্যদের দুই তিন জন ভারতবাসী হইলে তাঁহাদের আপত্তির কোন কারণ থাকিত না এবং তাঁহারা কমিশনের সহায়তা করিতে প্রস্তুত থাকিতেন। অপর একদলের ইহার বিরুদ্ধতা করিবার কারণ আরও মূলগত ছিল। তাঁহাদের আদর্শ



লর্ড বার্কেনহেড

এবং বিশ্বাস ছিল যে, দেশের শাসনতন্ত্রের প্রকৃত নির্ধারণ একমাত্র দেশবাসীরাই উত্তমরূপে করিতে পারেন। কয়েকজন ইংরেজ মিলিয়া সুদূর ভারতবর্ষের রাষ্ট্রতন্ত্র এবং শাসনপ্রণালী উত্তমরূপে গঠন করিবার সহায়তা করিবেন, ইহা একটি হাস্যকর এবং লজ্জাজনক ব্যাপার বলিয়া

তাঁহাদের মনে হইয়াছিল। সুতরাং ইহা সহজেই বুঝিতে পারা গেল যে, কমিশনের মতামত অধিকসংখ্যক ভারতবাসীরই মনঃপূত হইবে না। অনেক ভারতীয় নেতা এই সময় রাউণ্ড টেব্‌ল্ বৈঠকের (Round Table Conference) জন্য দাবী করিতেছিলেন। ইংরেজ-সরকারও এ বিষয়ে একটু ঝুঁকিয়া ছিলেন বলিয়া মনে হইতেছিল।



সার্ জন সাইমন

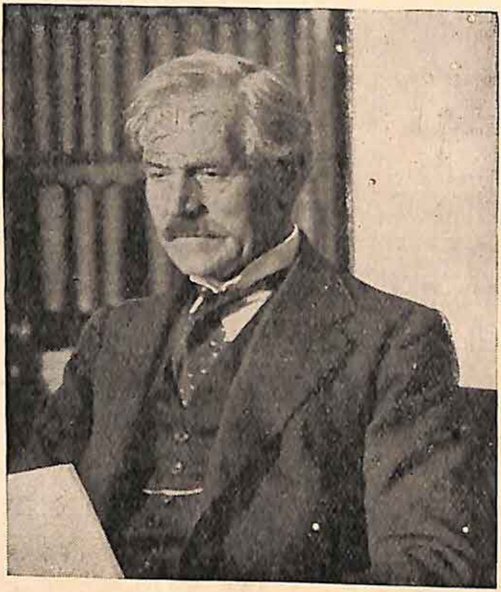
সাইমন কমিশনও একটি প্রকৃষ্ট কারণে অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহাদের বিবৃতি লোক সম্মুখে উপস্থিত করিবার পরে ঐরূপ একটি বৈঠকের প্রয়োজন হইবে। ভারতবর্ষের করদরাজ্যগুলির (Indian States) বিষয়ে তাঁহারা কোনই বিশেষ অনুসন্ধান করেন নাই; নৃপতিগণের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে কোনই মতামত তাঁহারা জানিতেন না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রতন্ত্রের নির্ধারণ

এই নৃপতিগণকে বাদ দিয়া হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহাদের মতামত জানিবার জন্য এবং ভারতবর্ষে এক যুক্তরাজ্য স্থাপনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি গোল-টেবল্-বৈঠকের প্রয়োজন আছে; কমিশনের সভাপতি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করায় রাউণ্ড টেবল্ কন্ফারেন্স ডাকা অবিলম্বেই সম্ভব হইল।

রাউণ্ড টেবল্ কন্ফারেন্স—১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দুই বৎসরের মধ্যে তিনটি বৈঠক লণ্ডন শহরে আহূত হইয়া ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়া অভিমত প্রকাশ করে। এই বৈঠকগুলির দ্বিতীয়টিতে মহাত্মা গান্ধী যোগদান করিয়াছিলেন। এই বিশদ পর্যালোচনার পর ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব প্রকাশিত করেন। এইগুলিকে 'হোয়াইট্ পেপার প্রপোজাল্স্' (White Paper Proposals) বলা হয়। এই প্রস্তাবগুলি প্রকাশ করিবার কয়েক মাস পূর্বে, নূতন শাসনতন্ত্রে ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির সদস্যসংখ্যা কত হইবে সে সম্বন্ধে তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যাম্জে ম্যাক্ডোনাল্ড (Ramsay Macdonald) এক সিদ্ধান্ত করিয়া ভারতবর্ষে প্রকাশিত করেন। এই সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও বৈষম্যের মীমাংসা রাউণ্ড টেবল্ বৈঠকেই হইবার কথা ছিল। কিন্তু হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ এই বিষয়ে কোন সুবিধাজনক মীমাংসা করিতে না পারায় প্রধান মন্ত্রীকে এই মীমাংসা করিবার ভার অর্পণ করেন। এ বিষয়ে তিনি যে সিদ্ধান্ত করিলেন তাহাই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (Communal Award) বলিয়া এখন পরিচিত।

ভারত গভর্নমেণ্ট আইন, ১৯৩৫—ইহার পর কমন্স এবং লর্ড সভার কয়েকজন সভ্য লইয়া একটি যুক্ত কমিটি নির্বাচন করা হয়।

এই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইলেন ভারতবর্ষের বর্তমান গভর্নর-জেনারেল লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো (Lord Linlithgow)। এই কমিটির নিকট হোয়াইট পেপার প্রস্তাবগুলি বিশদ আলোচনা ও প্রয়োজন্‌ মত পরিবর্তনের জন্য উপস্থিত করা হয়। কয়েকজন ভারতীয় প্রতিনিধি সহকারীভাবে (assessor) এই কমিটিতে স্থান পাইয়াছিলেন। যুক্ত

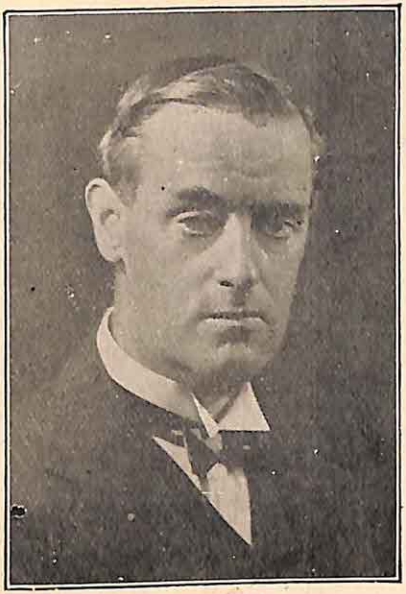


র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড

কমিটি অনেক অভিজ্ঞ ও গণ্যমান্য ব্যক্তির সাক্ষ্য লইয়া এক বিস্তারিত বিবৃতি প্রদান করেন। এই বিবৃতির অভিমতগুলিকে মূলগত করিয়া ইংরেজ সরকার একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করেন। কমন্স এবং লর্ড সভা এই খসড়া গ্রহণ করিবার পর ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অগস্ট

ইহা আইনে পরিণত হয়। এই আইনই ১৯৩৫ সনের ভারত গভর্নমেণ্ট আইন (Government of India Act) নামে অভিহিত।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে এই আইনের প্রাদেশিক শাসন সংক্রান্ত অংশ বলবৎ হয়। উক্ত তারিখে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ



লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো

হইতে বিচ্ছিন্ন হয় এবং এগারটি প্রদেশে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য প্রবর্তিত হয়। কয়েক মাস পরে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হয় এবং ক্রমে ক্রমে বাংলা, পঞ্জাব ও সিন্ধু ব্যতীত অন্য আটটি প্রদেশে কংগ্রেস দলভুক্ত মন্ত্রিগণ কার্যভার গ্রহণ করেন। ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস দলভুক্ত সভ্যগণের সংখ্যাধিক্য থাকায় এবং গভর্নর দৈনন্দিন শাসনকার্যে

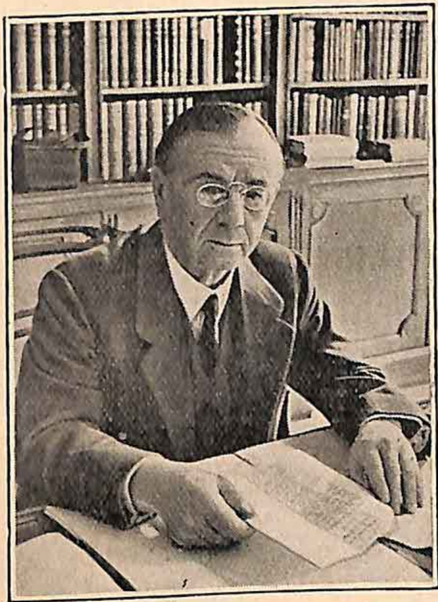
হস্তক্ষেপ না করায় কংগ্রেস দলভুক্ত মন্ত্রিগণ জাতিগঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন। বাংলা, পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে মুস্‌লিম লীগের প্রভাবাধীন মন্ত্রিসভা স্থাপিত হয়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডের সহিত জার্মানীর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কংগ্রেস দলভুক্ত মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করেন। কংগ্রেস এই শর্তে গভর্নমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত ছিল যে, যুদ্ধাবসানে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করা হইবে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এই শর্ত গ্রহণ করিলেন না। কংগ্রেস দলভুক্ত মন্ত্রিগণের পদত্যাগের পর আসামে মুস্‌লিম লীগের প্রভাবাধীন মন্ত্রিসভা গঠিত হইল, কিন্তু অন্য সাতটি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হইল না। তখন ঐ সাতটি প্রদেশের শাসনভার ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের আইনের একটি বিধান অনুযায়ী গভর্নরগণ গ্রহণ করিলেন। ঐ সকল প্রদেশে আইনসভার অধিবেশন বন্ধ রাখা হইল। এই ব্যবস্থা অদ্যাপি বলবৎ রহিয়াছে।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের আইনের যুক্তরাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যবস্থা অদ্যাপি কার্যে পরিণত হয় নাই। কংগ্রেস এবং মুস্‌লিম লীগ এই ব্যবস্থার বিরোধী ; দেশীয় নৃপতিগণও ইহার প্রবর্তনের জন্য আগ্রহান্বিত নহেন। কেন্দ্রীয় শাসনপদ্ধতি অদ্যাপি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের আইন অনুসারেই পরিচালিত হইতেছে। সম্প্রতি গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদ সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং ঐ পরিষদে ভারতীয় সভ্যগণের সংখ্যাধিক্য প্রবর্তিত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভারতসচিব ও তাঁহার পরামর্শদাতৃগণ

প্রদেশগুলির সমস্ত বিভাগে এবং কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের অধিকাংশ বিভাগে শাসনকার্য দায়িত্বমূলক করা নূতন আইনের একটি প্রধান



বর্তমান ভারতসচিব মিঃ এল্. এস্. এমেরি

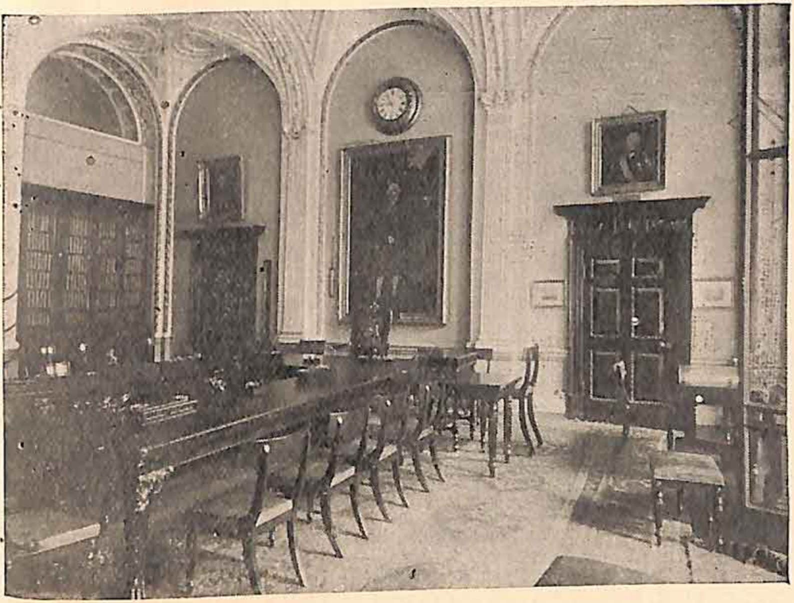
উদ্দেশ্য। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের আইন পাশ হইবার পূর্বে ভারতবর্ষের সমুদয় রাজকার্য পরিচালনার জন্য সপরিষদ ভারতসচিব ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের

নিকট বিশেষভাবে জবাবদিহি করিতে বাধ্য ছিলেন। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হইলে এই নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইয়াছিল। প্রদেশগুলির হস্তান্তরিত বিভাগগুলির শাসনকার্য স্থানীয় ব্যবস্থাপক পরিষদগুলির ইচ্ছানুসারে চলিবে, ইহাই মোটামুটি নিয়ম হইল। সুতরাং সেইগুলির উপর সপরিষদ ভারতসচিবের কর্তৃত্ব অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল। বর্তমান আইন অনুসারে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের অন্যান্য বিভাগে এবং কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের অধিকাংশ বিভাগের কার্য পরিচালনাতেও ভারতসচিবের কর্তৃত্ব ঐ পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

এতদিন ভারতীয় নেতৃগণ দাবী করিয়া আসিতেছিলেন যে, ভারত-সচিবের পরিষদ (The Council of India) তুলিয়া দেওয়া হউক; কিন্তু ইংরেজ সরকার বরাবর ঐ দাবী অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ভারতবর্ষের শাসনকার্য পরিচালনার গুরুতর দায়িত্ব তাঁহারা একমাত্র ভারতসচিবের হস্তে ন্যস্ত করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু নূতন শাসনতন্ত্রে এই দায়িত্বভার অনেক পরিমাণে স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলির হস্তে অর্পিত হওয়ায় ভারতসচিবের পরিষদের আর প্রয়োজন থাকিল না। সুতরাং নূতন আইন অনুসারে এই পরিষদ তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কিন্তু পরিষদ উঠিয়া গেলেও ভারতীয় শাসনকার্য ব্যাপারে ভারত-সচিবের অনেক বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট পরামর্শ লওয়া প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং স্থির হইল যে, ভারতসচিবের একদল পরামর্শদাতা (advisers) নিযুক্ত হইবেন। তাঁহাদের সংখ্যা তিনের কম এবং ছয়ের বেশী হইবে না। পরামর্শদাতাদিগকে নিযুক্ত করিবার সময় ভারতসচিবকে দেখিয়া লইতে হইবে যে, তাঁহাদের অন্তত অর্ধ সংখ্যা দশ বৎসরের বেশী ভারতবর্ষে রাজকর্মচারীর কার্য করিয়াছেন এবং দুই বৎসরের অধিককাল ঐ কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই।

পরামর্শদাতৃগণ একযোগে পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন এবং দ্বিতীয়বার তাঁহাদিগকে আর এই কার্যে নিযুক্ত করা হইবে না।



Buchanan & Co.

ভারতসচিবের পরিষদের মন্ত্রণা-কক্ষ

(এই ছবিতে সভাপতির যে চেয়ারখানি দেখা যাইতেছে উহা পূর্বে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চেয়ারম্যান কর্তৃক ব্যবহৃত হইত)

তাঁহাদের বার্ষিক বেতন হইবে ১৩৫০ পাউণ্ড ; কিন্তু ভারতীয় হইলে তাঁহারা আরও ৬০০ পাউণ্ড অধিক পাইবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা

ভারতবর্ষকে একটি মহাদেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই মহাদেশের জনসংখ্যার প্রায় চতুর্থাংশ এবং ভূসম্পত্তির শতকরা চল্লিশ ভাগ ভারতীয় নৃপতিগণের কর্তৃত্বাধীনে। অবশিষ্ট জনসংখ্যা এবং ভূসম্পত্তি ব্রিটিশ-ভারতের অন্তর্ভুক্ত। করদরাজ্যগুলিকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র ব্রিটিশ-ভারতের কথা ভাবিলেও দেখা যায় যে, এই বিপুল জনসংখ্যা এবং বিস্তীর্ণ রাজ্য এক কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের পক্ষে যথাযথভাবে শাসন করা প্রায় অসম্ভব। এই কথা ব্রিটিশ-ভারতের নেতৃগণের মনে অনেকদিন পূর্বেই উদয় হইয়াছিল। তাঁহারা দাবী করিতেছিলেন যে, প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলির হস্তে অধিক ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়া এবং কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের দায়িত্ব অনেক পরিমাণে লঘু করিয়া এক যুক্তরাষ্ট্র (Federation) স্থাপন করা হউক। বাংলার নেতা স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল এই আদর্শের একজন বিশিষ্ট সমর্থনকারী ছিলেন। ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতসচিবের নিকট এ দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে যে বিশদ বিবৃতি পাঠাইয়াছিলেন তাহাতেও এই যুক্তরাষ্ট্রের আভাস কিয়ৎ পরিমাণে পাওয়া যায়। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হইলে ভারতীয়দিগের পক্ষ হইতে যুক্তরাষ্ট্রের দাবী ক্রমশ আরও প্রবল হইতে লাগিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ-ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি মিলিয়া স্বর্গীয় পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীনে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির

উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ-ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া প্রস্তুত করা। সার্ তেজবাহাদুর সপ্রু ইহার একজন অন্যতম সভ্য ছিলেন। কমিটি কয়েকমাস আলোচনা করিয়া যে খসড়া প্রস্তুত করেন তাহাতে ব্রিটিশ-ভারতে এক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিবার প্রস্তাব বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছিল।



সার্ তেজবাহাদুর সপ্রু

করদরাজ্যের নৃপতিগণ অনেক বিষয়ে ব্রিটিশ-গভর্নমেণ্টের কর্তৃত্বাধীন হইলেও নিজেদের রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাঁহাদিগকে একপ্রকার একচ্ছত্র অধিপতি বলা যায়। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড-সংস্কার প্রবর্তনের পূর্বে তাঁহারা কেবলমাত্র ব্রিটিশ-গভর্নমেণ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

নৃপতিবর্গ আপনাদের মধ্যে অবাধে মেলামেশা এবং ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারিতেন না। একত্র সম্মিলিত হইয়া কোন কার্য করিবার অধিকার তাঁহাদের ছিল না। কিন্তু ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে নূতন শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হইলে এক নরেন্দ্রমণ্ডল (Chamber of Princes) প্রতিষ্ঠিত হয়। এইবার তাঁহারা অবাধে সম্মিলিত হইবার সুযোগ পাইলেন এবং নিজেদের সুখ-সুবিধার কথা ভাবিতে আরম্ভ করিলেন। এখন তাঁহাদের মনে হইল, ব্রিটিশ-গভর্নমেণ্ট অনেক অধিকার হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন। এতদিন ভারত-গভর্নমেণ্ট ইংরেজের করতলগত ছিল। কিন্তু এখন ক্রমশ ইহা ভারতীয়দিগের হস্তগত হইতেছে। নৃপতিগণ ইংরেজের কর্তৃত্ব মানিয়া লইয়াছেন বটে, কিন্তু ব্রিটিশ-ভারতীয়গণের কর্তৃত্ব তাঁহারা মানিবেন কেন? তাঁহাদের দাবী ক্রমশ বাড়িয়া চলিল। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই ডিসেম্বর এক কমিটি নিযুক্ত হইল। সার্ হারকোর্ট বাট্‌লার (যুক্তপ্রদেশের ভূতপূর্ব গভর্নর) ইহার সভাপতি হইলেন এবং তাঁহার নামানুসারে ইহা 'বাট্‌লার কমিটি' (Butler Committee) নামে পরিচিত। এই কমিটির অভিমতগুলি নৃপতিগণের সম্পূর্ণ মনঃপূত না হইলেও কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। নৃপতিবর্গ চাহিয়াছিলেন যে, ভারত-সরকার এতদিন পর্যন্ত তাঁহাদের উপর যে কর্তৃত্ব করিয়াছেন তাহা ভবিষ্যতে ঐ সরকারের উপর ন্যস্ত না থাকিয়া ভারত-সম্রাটের নিজ হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং কার্যত তাঁহার প্রতিনিধি এই ক্ষমতার ব্যবহার করিবেন। 'বাটলার কমিটি' এই দাবী গ্রাহ্য করিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

করদরাজ্যের নৃপতিবর্গ ব্রিটিশ-ভারত হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিলেন বটে, কিন্তু ব্রিটিশ ভারতের সহিত তাঁহাদের রাজ্যগুলি

ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বহিঃশুল্ক প্রবর্তন, রেলওয়েগুলির পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা প্রভৃতি কার্য পৃথক্‌ভাবে করিবার অসুবিধা অনেক। সাইমন-কমিশন এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়াই ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রতিনিধি ও নৃপতিবর্গ লইয়া এক রাউণ্ড টেব্‌ল্‌ বৈঠক বসাইবার পরামর্শ



সার্‌ হারকোর্ট বাট্‌লার

দিয়াছিলেন। সুতরাং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে এই বৈঠক বসাইবার সিদ্ধান্ত হইবার পর যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতময় এক সাড়া পড়িয়া গেল। এ বিষয়ে নৃপতিবর্গের মধ্যেও বিশেষ উৎসাহ লক্ষিত হইল। রাউণ্ড টেব্‌ল্‌ বৈঠক লণ্ডনে বসিবার পর নৃপতিদিগের অনেকে

যুক্তরাষ্ট্র-স্থাপন বিষয়ে আন্তরিক সহানুভূতি দেখাইয়া মুক্তকণ্ঠে বক্তৃতা করিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ফেডারেশন সম্বন্ধে তাঁহাদের সঠিক কোন ধারণা ছিল না। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, নিজেদের রাজ্য-গুলিতে তাঁহাদের অধিকার এবং ক্ষমতা যেরূপ রহিয়াছে সেইরূপই অক্ষুণ্ণ থাকিবে ; অধিকন্তু তাঁহারা কেন্দ্রীয় (federal) গভর্নমেণ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া উহার কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবেন এবং ব্রিটিশ-ভারতের শাসনকার্যের উপরেও তাঁহারা কতক পরিমাণে কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহাদের রাজ্যে ফেডারেল্ গভর্নমেণ্ট কোন প্রকারেই হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। ঐ গভর্নমেণ্টের অভিমত তাঁহারা মানিয়া লইলেই উহা তাঁহাদের রাজ্যে কার্যকরী হইবে ; অন্যথায় নহে। এই আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়া রাজন্যবর্গ ফেডারেশনের পৃষ্ঠপোষকতা করিলেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেডারেল্ গভর্নমেণ্টের অংশীদার হইলে একদিকে যেমন লাভবান্ হওয়া যায়, অপরদিকে কতকগুলি ক্ষমতা ত্যাগ করিবার প্রয়োজনও হয়। যে সমস্ত বিষয় ফেডারেল্ গভর্নমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে, সেগুলির উপর যেমন প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের কোনও কর্তৃত্ব করা সম্ভব হইবে না, সেইরূপ কোনও নৃপতিরও সেগুলির উপর কোনও অধিকার থাকিতে পারিবে না। একটি উদাহরণ দিলে সহজেই ইহার অর্থ বোধগম্য হইবে। রেলওয়েগুলি যদি ফেডারেল্ গভর্নমেণ্টের অধীন করা যায় তাহা হইলে এগুলির পরিচালনার ভার ঐ গভর্নমেণ্টের উপরেই ন্যস্ত থাকিবে। রেলওয়েগুলি কোন প্রদেশের মধ্য দিয়া চলিতে পারে কিন্তু প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের নিজস্ব কোন কর্তৃত্ব ইহাদের উপর থাকিতে পারিবে না। আবার এইগুলি কোন নৃপতির রাজ্যের মধ্য দিয়াও পরিচালিত হইতে পারে। কিন্তু সেই নৃপতিরও ইহাদের

উপর নিজস্ব কোন অধিকার থাকিবে না। তাঁহার মতামতের উপর রেলওয়ের পরিচালনা নির্ভর করিবে না। কিন্তু রাজন্যবর্গ ব্যাপারটি এতটা তলাইয়া দেখেন নাই। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন ফেডারেল্ গভর্নমেণ্টে যোগদান করিয়া ইহার কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের রাজ্যে প্রতি ব্যাপারে তাঁহাদের নিজস্ব মতামত প্রয়োগ করিবেন। যখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, এইরূপ দুইদিক দিয়া কর্তৃত্ব করিবার সুযোগ যুক্তরাষ্ট্রে থাকা কঠিন হইবে, তখন তাঁহাদের ফেডারেশনের জন্য উৎসাহ অনেকখানি কমিয়া গেল। রাজন্যবর্গের অনেকে এখন পশ্চাৎপদ হইবার চেষ্টায় রহিলেন।

কিন্তু ইংরেজ-সরকার ঠিক করিয়াছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র গঠিত না হইলে এবং রাজন্যবর্গ কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলে ঐ গভর্নমেণ্টে দায়িত্বমূলক শাসননীতি প্রবর্তন করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং ইংরেজ-সরকার হাল ছাড়িলেন না। নৃপতিবর্গের ইচ্ছা এবং আশার বিশেষ পরিবর্তন না হওয়া সত্বেও কেবলমাত্র ইংরেজ-সরকারের অভিলাষ অনুসারে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের কন্স্টিটিউশন অ্যাক্টে ভারতবর্ষে করদরাজ্যগুলিকে লইয়া এক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যবস্থা হইলেও যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার এখনও বিলম্ব আছে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে নূতন অ্যাক্ট অনুসারে অন্যান্য বিষয়ে শাসনকার্য আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে পার্লামেণ্টের লর্ডস্ এবং কমন্স সভাকে ঐ মর্মে সম্রাটের নিকট আবেদন করিতে হইবে। এই আবেদন করিবার পর যদি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পথে যে সকল অন্তরায় আছে সেগুলি দূরীভূত হয়, তাহা হইলে ব্রিটিশ-ভারতের প্রদেশগুলি এবং যে-সমস্ত করদরাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিতে অভিলাষী

তাহাদিগকে লইয়া এক ফেডারেশন গঠিত করা হইবে। তবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিবার অভিলাষী করদরাজ্যগুলির সংখ্যা অত্যল্প হইলে উহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিতে ইচ্ছক এইরূপ করদরাজ্যগুলির জনসংখ্যা যদি সমুদয় করদরাজ্যের মিলিত জনসংখ্যার অর্দ্ধাংশ হয় তবেই উহা স্থাপিত হইতে পারিবে। এই বিষয়ে আরও একটি শর্ত পালন করিবার আছে। যে সকল করদরাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক তাহাদের নৃপতিগণ যদি রাষ্ট্রীয় পরিষদে (Council of State) অন্তত ৫২ জন সদস্য প্রেরণ করিতে অধিকারী হন তবেই যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। যে সমস্ত রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশার্থী হইবে তাহাদের রাজন্যগণকে এক কবুলিয়তে (Instrument of Accession) স্বাক্ষর দিতে হইবে। যে সকল রাষ্ট্রীয় বিষয় তাঁহারা ফেডারেল্ গভর্নমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিবেন এই কবুলিয়তে সেগুলি বিশেষভাবে উল্লিখিত থাকিবে। নৃপতিগণকে এই কবুলিয়তে স্পষ্টভাবে অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, এই বিষয়গুলির শাসন-ব্যাপারে তাঁহারা তাঁহাদের রাজ্যগুলিতে ফেডারেল্ গভর্নমেণ্টের অধিকার এবং কর্তৃত্ব মানিয়া চলিবেন এবং প্রয়োজন হইলে এই শাসন-ব্যাপারে ঐ গভর্নমেণ্টের সহায়তা করিবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ফেডারেল্ গভর্নমেণ্ট ও প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের কার্যবিভাগ

প্রতি যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের শাসনকার্যের বিষয়গুলি যতদূর সম্ভব বিভিন্ন রাখা হয়। একের সহিত অপরের যাহাতে কোন প্রকার সংঘর্ষ না ঘটে সেজন্য উভয় গভর্নমেণ্টের পরস্পরের কর্তব্যের মাত্রা ও অধিকারের সীমা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। ভারতবর্ষীয় ফেডারেশনেও যাহাতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম না হয় সেজন্য ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের কন্‌স্টিটিউশন অ্যাক্টে ফেডারেল্ এবং প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের কর্তব্যগুলি অতি সূক্ষ্মভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে। সর্বসমেত কর্তব্যগুলির তিনটি তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রথমটিতে ফেডারেল্ গভর্নমেণ্টের এবং দ্বিতীয়টিতে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের কর্তব্যগুলি নির্ধারিত আছে। তৃতীয়টিতে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে সেগুলির উপর উভয় গভর্নমেণ্টের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে ফেডারেল্ গভর্নমেণ্ট যদি কিছু না করেন তবেই প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট সেইগুলির উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন ; অন্যথায় নহে।

ফেডারেল্ গভর্নমেণ্টকে ৫৯টি বিষয়ের উপর একচ্ছত্র অধিকার দেওয়া হইয়াছে। প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের কার্যতালিকায় ৫৪টি বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় এবং সম্মিলিত অধিকারের বিষয়গুলির

সংখ্যা ৩৬। ফেডারেল্ গভর্নমেণ্টের কার্য-তালিকার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

১। নৌ-শক্তি, সামরিক-শক্তি এবং বিমান-শক্তি।

২। পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় কার্য।

৩। ডাকবিভাগ পরিচালনা।

৪। সেন্সাস (census) লওয়া।

৫। ফেডারেল্ রেলওয়েগুলির পরিচালনা এবং অন্যান্য অধিকাংশ রেলওয়ের উপর কতকগুলি ব্যাপারে আধিপত্য করা।

৬। নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে রপ্তানি এবং তাহার ভিতরে আমদানির উপর কর্তৃত্ব করা।

৭। প্রধান বন্দরগুলির তত্ত্বাবধান করা।

৮। বীমা আইন প্রণয়ন করা।

৯। যৌথভাবে ব্যাঙ্কিং কার্যের উপর অধিকার।

১০। বহিঃশুল্কের নির্ধারণ।

১১। যৌথ কারবারের উপর ট্যাক্স বসান।

১২। লবণ-কর বসান।

১৩। আয়কর স্থাপন।

প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের কার্য-তালিকার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য :—

১। প্রদেশের শান্তিরক্ষা।

২। পুলিশ।

৩। জেলখানা।

৪। স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণ।

৫। জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতির বন্দোবস্ত এবং হাঁসপাতাল প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা।

৬। শিক্ষাবিভাগ পরিচালনা।

৭। কৃষিবিভাগ পরিচালনা।

৮। খাজনা আদায়।

৯। আব্গারি-বিভাগ পরিচালনা এবং তাহা হইতে আয়ের ব্যবস্থা।

সম্মিলিত তালিকার বিষয়গুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ—

১। ফৌজদারী আইন।

২। ফৌজদারী বিচার করিবার নিয়মাবলী।

৩। দেওয়ানী বিচার করিবার নিয়মাবলী।

৪। ফ্যাক্টরীর উপর কর্তৃত্ব।

৫। ট্রেড ইউনিয়নগুলির নিয়ন্ত্রণ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ফেডারেল্ গভর্নমেণ্টের সহিত প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের ও যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত দেশীয় রাজ্যসমূহের সম্পর্ক

বিভিন্ন গভর্নমেণ্টের অধিকারগুলি যতদূর সম্ভব আইনত-বিভক্ত হইলেও কার্যত তাহাদের মধ্যে ঐ অধিকার লইয়া সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়া আশ্চর্য নহে। সূক্ষ্মভাবে সকল অধিকার বিভক্ত করা বাস্তবিক সম্ভব নহে। সুতরাং এক গভর্নমেণ্টের নিজের এলাকা অতিক্রম করিয়া অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা বিচিত্র নহে। এইরূপ সংঘর্ষের প্রতিবিধানের জন্য একটি ফেডারেল্ বিচারালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিলে, অথবা কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট কোনও যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করদরাজ্যের এলাকায় অনধিকার চর্চা করিলে, অথবা অন্য কোনও ভাবে দুই বা ততোধিক গভর্নমেণ্টের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিলে বিরোধের বিষয়গুলি ফেডারেল্ বিচারালয়ের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইতে পারে। এই ব্যাপারে এই বিচারালয় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন তদনুসারে গভর্নমেণ্টগুলিকে চলিতে হইবে।

ফেডারেল্ গভর্নমেণ্ট যে-সকল আইন প্রণয়ন করিবেন প্রদেশগুলিতে সাধারণত ঐ গভর্নমেণ্টের কর্মচারীরাই সেগুলি কার্যকরী হইল কিনা দেখিবেন। তবে প্রয়োজন হইলে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের উপর ভার দিতে পারেন। এইরূপ ভার

প্রাপ্ত হইলে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টকে দেখিতে হইবে উক্ত আইনগুলি সর্বত্র কার্যকরী হইতেছে কি না।

যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত দেশীয় রাজ্যগুলিকেও ফেডারেল্ গভর্নমেণ্টের আইন সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। ঐ রাজ্যগুলিতে ফেডারেল্ আইন সকল যাহাতে কোনও প্রকারে অমান্য না হয় সে-বিষয়ে নৃপতিগণকে সচেষ্ট থাকিতে হইবে। নৃপতিগণ নিজেদের কর্মচারী দ্বারা ঐ আইনগুলি আপন আপন রাজ্যে কার্যকরী করিবেন বলিয়া ফেডারেল্ গভর্নমেণ্টের সহিত চুক্তি করিয়া লইতে পারেন। তবে এই চুক্তি অনুসারে বস্তুত কার্য চলিতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য গভর্নর জেনারেল স্বয়ং রাজ্যগুলি পরিদর্শন করিতে পারিবেন। যদি পরিদর্শন করিয়া অথবা অন্যভাবে অনুসন্ধান করিয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে কার্যগুলি প্রকৃষ্টরূপে চলিতেছে না, তাহা হইলে ঐগুলি উত্তমরূপে চালাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি নৃপতিগণকে উপদেশ দিতে পারিবেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ফেডারেল্ শাসনবিভাগ (The Federal Executive)

গভর্নর জেনারেল—ভারতবর্ষে একজন করিয়া গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত থাকিবেন। ইংলণ্ডের অধীশ্বর ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে এতদিন যেভাবে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া আসিয়াছেন সেইভাবেই নূতন যুগেও তাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন। এতদিন পর্যন্ত সন্ধি এবং প্রথা অনুসারে গভর্নর জেনারেলই করদরাজ্যগুলির উপর কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু নূতন আইন অনুসারে এই শেষোক্ত কার্যের ভার একজন পৃথক্ রাজপ্রতিনিধি (His Majesty's Representative for the exercise of the functions of the Crown in its relations with Indian States) নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করা হইবে। তবে ইংরেজ-সরকার ইচ্ছা করিলে একই ব্যক্তিকে গভর্নর জেনারেল এবং রাজপ্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করিতে পারেন। সম্প্রতি উভয় কার্যের ভার একই ব্যক্তির উপর অর্পিত হইয়াছে এবং গভর্নর জেনারেলই করদরাজ্যগুলির উপর কর্তৃত্ব করিতেছেন। আশা করা যায়, ভবিষ্যতেও এই ব্যবস্থাই বলবৎ থাকিবে।

গভর্নর জেনারেল বরাবরই ভারতবর্ষের একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী রাজপুরুষ। নূতন রাষ্ট্রতন্ত্রে তাঁহার ক্ষমতার আরও বৃদ্ধি হইয়াছে এবং দায়িত্বভার গুরুতর হইয়াছে। তাঁহার নিয়োগকাল আইনে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। তবে অনুমান করা যায় যে,

পূর্বের মত এখনও তিনি সাধারণত পাঁচ বৎসরের জন্যই কর্তব্যভার গ্রহণ করিবেন।

গভর্নর জেনারেলের উপদেষ্টাগণ ও মন্ত্রিপরিষদ—ফেডারেল্ গভর্নমেণ্টের হস্তে যে-সকল কার্যভার অর্পণ করা হইয়াছে সেগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। কতকগুলি বিভাগ মন্ত্রিগণের হস্তে ন্যস্ত থাকিয়া মোটামুটি আইনসভার মতানুসারে পরিচালিত হইবে। অন্যান্য গুলি পরিচালনার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে গভর্নর জেনারেলের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। সমরবিভাগ (defence), পররাষ্ট্রবিভাগ (external affairs), খ্রীষ্টান্ ধর্মযাজকদিগের বিষয়গত বিভাগ (ecclesiastical affairs) এবং উপজাতি কর্তৃক অধ্যুষিত অঞ্চলের (tribal areas) শাসনকার্য গভর্নর জেনারেল স্বয়ং পরিচালিত করিবেন। তবে এই পরিচালনার সুবিধার জন্য তিনি ইচ্ছা করিলে তিনের অনধিক উপদেষ্টা (counsellors) নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

অন্যান্য বিভাগগুলি পরিচালনার জন্য দশজনের অনধিক মন্ত্রী নিযুক্ত হইবেন। আইনসভার সদস্যদিগের মধ্য হইতেই গভর্নর জেনারেল মন্ত্রিগণকে মনোনীত করিবেন। যদি কখনও আইনসভার বাহির হইতে তিনি কোন ব্যক্তিকে মন্ত্রিপদে মনোনীত করেন তাহা হইলে ছয় মাসের মধ্যে ঐ মন্ত্রীকে আইনসভার সদস্য হইতে হইবে, নতুবা মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে হইবে। প্রথমে গভর্নর জেনারেল এক ব্যক্তিকে প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিবেন এবং পরে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া অন্যান্য মন্ত্রী মনোনীত করিবেন। মনোনয়নকালে তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে যে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়া প্রয়োজন। গভর্নর জেনারেল ইচ্ছা করিলে যে-কোনও সময় মন্ত্রিসভার পরিবর্তন করিতে পারিবেন। বস্তুত মন্ত্রিগণের মনোনয়ন এবং অবসর-গ্রহণ অনেক

পরিমাণে তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা প্রয়োজন যে মন্ত্রিগণ তাঁহাদের বিভাগগুলির পরিচালনার জন্য আইনসভার নিকটেও জবাবদিহি করিতে বাধ্য থাকিবেন। আইনসভা ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের কার্যে বহাল থাকিবার বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন এবং উহা গৃহীত হইলে তাঁহাদের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে হইবে।

গভর্নর জেনারেলের বিশেষ দায়িত্বসমূহ—যে-সকল বিভাগ মন্ত্রিগণের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে সেগুলির উপর গভর্নর জেনারেলের কোনও ক্ষমতা থাকিবে না, ইহা মনে করা ভুল। সাধারণত সেগুলি আইনসভার ইচ্ছা অনুসারেই পরিচালিত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন কোন বিশেষ ব্যাপারে ঐগুলির উপর গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা অপ্রতিহত থাকিবে। দেশে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা দূর করিবার জন্য, ফেডারেল্ গভর্নমেণ্টের অর্থনৈতিক অবস্থা যাহাতে সঙ্কটাপন্ন না হয় তাহা দেখিবার জন্য, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির উপর অবিচার না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য, সিভিল সার্ভিসের আইনসঙ্গত অধিকারগুলি বজায় রাখিবার জন্য, ইংলণ্ড ও ব্রহ্মদেশ হইতে মাল আমদানীর পথে যাহাতে অন্যায়ভাবে কোনও বিঘ্ন না ঘটে তাহা দেখিবার জন্য এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের অধিকারগুলি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যে-কোনও সময়ে গভর্নর জেনারেল্ এই বিভাগগুলির উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন। এই কর্তৃত্ব গভর্নর জেনারেলের বিশেষ দায়িত্ব (Special Responsibilities) বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

এই বিশেষ দায়িত্ব অনুসারে কাজ করিতে গিয়া গভর্নর জেনারেল কখনও কখনও কোনও নূতন আইন প্রণয়ন প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতে পারেন। আইনসভার অনুমতি না লইয়াই প্রয়োজন অনুসারে

এই সকল বিষয়ের আইন করিবার ক্ষমতা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে আইনসভার নিকট কোন খসড়া (bill) উপস্থিত না করিয়াই তিনি উহা অবিলম্বে আইন বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করিলে খসড়াটি আইনসভার নিকট উপস্থিত করিয়া ঐ সভার সদস্যদিগকে ইহার আলোচনা করিতে বলিতে পারেন। তবে আলোচনা যে-ভাবেই হউক না কেন, ইচ্ছা অনুসারে তিনি পরিবর্তিত অথবা অপরিবর্তিত অবস্থায় খসড়াটিকে আইনে পরিণত করিতে পারেন। আইনসভার ইহাতে কিছু বলিবার থাকিবে না।

অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন—অনেক সময় স্থায়ীভাবে আইনের প্রয়োজন না হইলেও উল্লিখিত বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য অস্থায়ীভাবে কোন আইন প্রয়োজনীয় হইতে পারে। এই কারণে গভর্নর জেনারেলকে অর্ডিনান্স (ordinance) পাশ করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। এই অর্ডিনান্স ছয় মাসের বেশি স্থায়ী হইতে পারিবে না। তবে এই ছয় মাস অতিবাহিত হইলে এবং তখনও প্রয়োজন বোধ করিলে পুনরায় ছয় মাসের জন্য উহা বহাল রাখিতে পারিবেন। কেবল বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্যই যে গভর্নর জেনারেল অর্ডিনান্স পাশ করিতে পারিবেন এমন নহে। কোন কোন সময়ে এমন ঘটিতে পারে যে আইনসভা উপস্থিত নাই, অথচ দেশের অবস্থা অনুযায়ী কোন নূতন আইনের অবিলম্বে প্রয়োজন। এরূপ অবস্থায় গভর্নর জেনারেল প্রয়োজনমত অর্ডিনান্স প্রণয়ন করিতে পারেন। কিন্তু আইনসভা বসিলেই উহার সম্মুখে অর্ডিনান্সটি উপস্থিত করিতে হইবে। আইনসভা ইচ্ছা করিলে অবিলম্বেই ঐ অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন। তাহার ফলে অর্ডিনান্সটি অবিলম্বে নাকচ হইবে। এ বিষয়ে কোন

প্রস্তাব গৃহীত না হইলেও আইনসভা বসিবার ছয় সপ্তাহের পর অর্ডিনান্সটি আর কার্যকরী হইবে না।

সমরবিভাগের পরিচালনা—এতদিন পর্যন্ত সমরবিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত-গভর্নমেণ্ট আইন অনুসারে এই দায়িত্ব কেবলমাত্র গভর্নর জেনারেলের উপর সমর্পণ করা হইয়াছে। সম্ভবত এই বিভাগ উত্তমরূপে পরিচালনার জন্য গভর্নর জেনারেলকে একজন উপদেষ্টা (counsellor) নিযুক্ত করিতে হইবে। বর্তমানে সমরবিভাগের কর্মকর্তা স্বয়ং সৈন্যাধ্যক্ষ (commander-in-chief)। ভবিষ্যতে সমরবিভাগের কার্য পরিচালনার জন্য তাঁহাকেই ঐ বিভাগের উপদেষ্টা-রূপে নিযুক্ত করা হইবে কিংবা অপর অন্য কাহাকেও ঐ পদ দেওয়া হইবে, তাহা এখনও সঠিক বলিতে পারা যায় না। তবে সৈন্যাধ্যক্ষ মহাশয় উপদেষ্টারূপে নিযুক্ত না হইলেও তাঁহার উপরেই এই বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব অধিক পরিমাণে ন্যস্ত থাকিবে, সন্দেহ নাই।

সেনাবিভাগে ভারতবাসী—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহের পরে এদেশের সৈন্যবল প্রায় দুই লক্ষ করা হয়। তন্মধ্যে ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা ৬২ হাজার। পরে সৈন্যসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মোট সৈন্যসংখ্যা হইয়াছিল ২ লক্ষ ২৩ হাজার। তাহার মধ্যে ইউরোপীয় সৈন্যসংখ্যা ছিল ৭৬ হাজার। সমুদয় সৈন্যসংখ্যার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ইউরোপ হইতে আমদানী হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সাধারণ সৈন্যদিগকে চালাইবার জন্য যে-সকল সামরিক কর্মচারীর (officers) প্রয়োজন হইয়া থাকে তাঁহাদের অধিকাংশই ইংরেজ। সিপাহী-বিদ্রোহের পরে ভারতীয়দিগকে উচ্চ কর্মচারীর পদে নিযুক্ত করিবার প্রথা একরূপ তুলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু

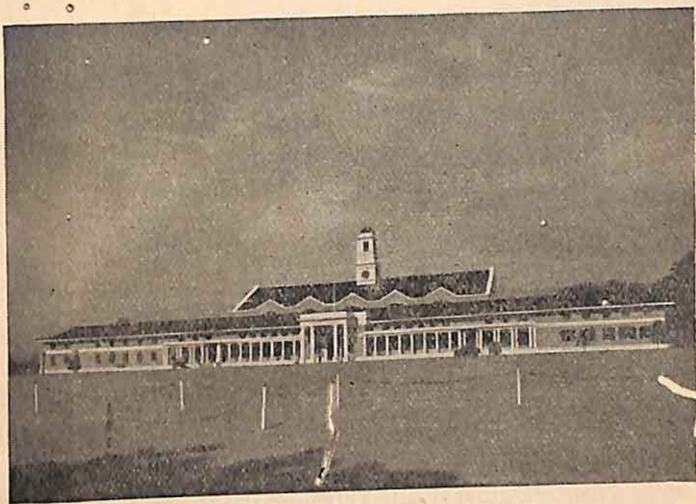


ভারতীয় সৈন্য

বিগত মহাসমরের সময় ভারতীয়দিগকে কর্মচারীর পদলাভ হইতে বঞ্চিত করিবার যে-প্রথা এতদিন চলিয়া আসিতেছিল তাহার ব্যতিক্রম করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গভর্নমেণ্টের মনে হইল। এখন হইতে দুই চারিজন করিয়া ভারতীয় যুবককে কর্মচারীর পদে নিযুক্ত করিবার নিয়ম প্রবর্তিত হইল। কিছুদিন পূর্বে স্থির হইয়াছে যে, ভারতীয় সৈন্যদলের আটটি বিভাগে (units) সমুদয় কর্মচারী ভারতীয়দিগের মধ্য হইতে ক্রমশ নিযুক্ত করা হইবে। সম্প্রতি ইউরোপীয় যুদ্ধের জন্য বহু অতিরিক্ত সামরিক কর্মচারী ও সৈন্য ভারতীয়দের মধ্য হইতে নিয়োগ করা হইতেছে।

ভারতীয় সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন—ভারতীয় সামরিক কর্মচারীদিগের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য পূর্বে এদেশে কোন বন্দোবস্ত ছিল না। এই বন্দোবস্ত ভারতবর্ষে করিবার কল্পনা কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে চলিতেছিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে এই বিষয়ে তদন্ত করিয়া বিবৃতি প্রদান করিবার জন্য সার্ এণ্ড্রু স্কীনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছিল। ইহা উল্লেখযোগ্য যে স্বর্গীয় পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু এই কমিটির একজন সভ্য ছিলেন। কমিটির বিবৃতি ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার তিন বৎসর পরে লণ্ডনে রাউণ্ড টেবল্ বৈঠক বসিলে ইহার কয়েকজন সভ্য লইয়া ভারতীয় সামরিক ব্যাপার আলোচনা করিবার জন্য এক সাব-কমিটি গঠিত করা হয়। এই সাব-কমিটির অভিমত অনুসারে সামরিক ব্যাপারে অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ কয়েক-জন ব্যক্তিকে লইয়া অপর একটি কমিটি নিযুক্ত করা হয়। এই কমিটিকে ‘ভারতীয় সামরিক বিদ্যালয় কমিটি’ নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। ইহার পরামর্শ অনুসারে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে দেরাদুনে ভারতীয় সামরিক বিদ্যালয় (Indian Military Academy) প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

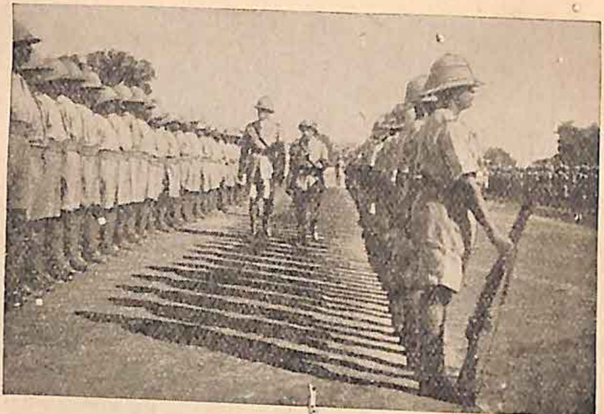
পূর্বে বলা হইয়াছে যে সাধারণ সৈন্যদিগের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই ভারতীয়দিগের মধ্য হইতে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, সকল শ্রেণীর এবং সকল প্রদেশের ভারতবাসী সৈনিকের পদে নিযুক্ত হইতে পারে না। সিপাহীবিদ্রোহের পর হইতে সৈনিকদিগকে কতকগুলি বিশেষ প্রদেশ এবং শ্রেণী হইতে সংগ্রহ



দেরাদূনের ইণ্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমী

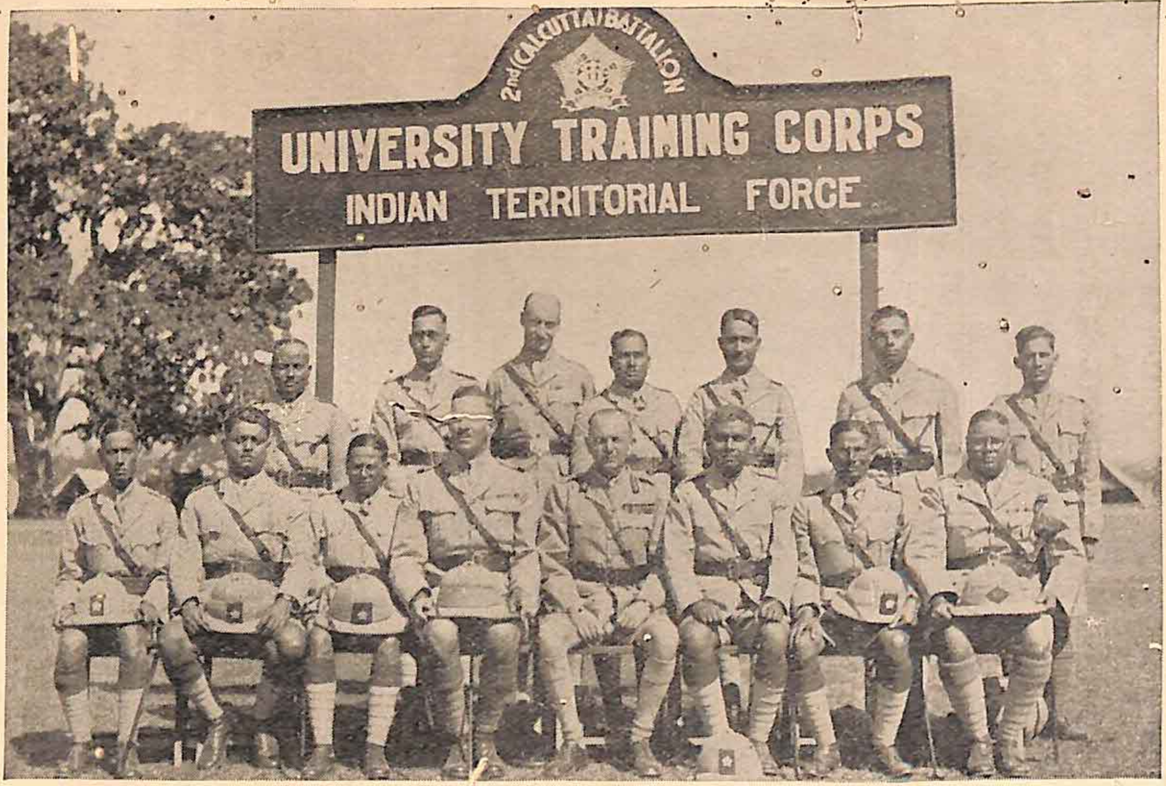
করিবার নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। যে-সকল লোকের মধ্য হইতে সৈনিকদিগকে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে তাহাদিগকে "সামরিক জাতি সমূহের" (martial races) অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। যাহারা এই "সামরিক জাতির" অন্তর্ভুক্ত নহে তাহাদের মধ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ করা হয় না। বাঙালী "সামরিক জাতির" অন্তর্ভুক্ত নহে; সুতরাং তাহাদিগকে সাধারণ সৈন্য হিসাবে নিযুক্ত করা হয় না।

ভারতীয় টেরিটোরিয়াল্ ফোর্স ও ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর গঠন—রীতিমতভাবে সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত না থাকিয়াও ভারতবাসিগণ যাহাতে সামরিক কার্যে উৎসাহিত হইতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে যুদ্ধবিগ্রহে যোগদান করিতে পারে তাহার ব্যবস্থার জন্য ভারতীয় টেরিটোরিয়াল ফোর্স (Indian Territorial Force)



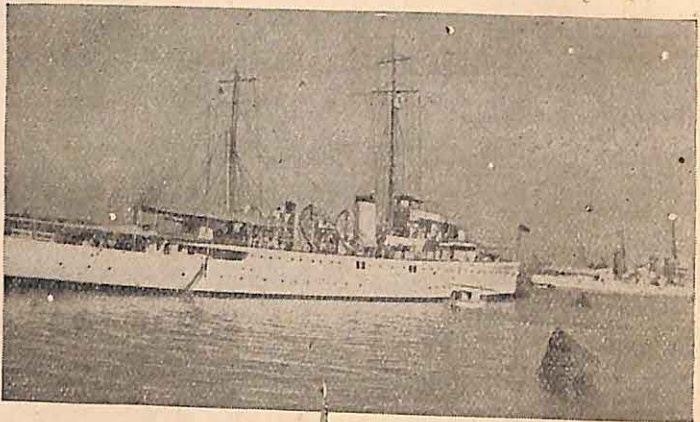
ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর

এবং ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর (University Training Corps) প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, লাহোর প্রভৃতি শহরে ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর স্থাপিত হইয়াছে। ইউনিভার্সিটির অন্তর্ভুক্ত কলেজসমূহের ছাত্র এবং অধ্যাপকগণ এই কোরে যোগদান করিয়া যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে সামান্য শিক্ষালাভ করিতে পারেন। তবে এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন বলিয়া প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাহাতে তাঁহাদিগকে যোগদান করিতেই হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই।



ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরের অফিসারগণ

নৌবিভাগ ও বিমানবহর প্রতিষ্ঠা—যুদ্ধকার্য কেবলমাত্র সৈনিকদিগের দ্বারাই সর্বদা সম্ভবপর হয় না। ইহার জন্য নৌবহরেরও বিশেষ প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভারতীয় গভর্নমেণ্ট খরচ কমাইবার অভিপ্রায়ে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে নিজেদের নৌবিভাগ তুলিয়া দেন। সমুদ্র-পথে যাহাতে ভারত আক্রমণ সম্ভবপর না হয় সেজন্য ইংলণ্ডের



এইচ. আই. এম্. এস্. "হিন্দুস্থান"

নৌবিভাগের কয়েকখানি জাহাজ ভারতীয় উপকূল-রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত থাকে। ইহার জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট ইংরেজ সরকারকে বার্ষিক ১ লক্ষ পাউণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। কিছুদিন হইতে ভারতীয়গণ দাবী করিতেছেন যে ভারত-গভর্নমেণ্টের নিজস্ব একটি নৌবিভাগ প্রতিষ্ঠিত করা হউক। এই আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষে একটি নৌবিভাগ (Royal Indian Navy) স্থাপনের জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছেন এবং সম্প্রতি এই বিষয়ে ভারত গভর্নমেণ্ট অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন।

আজকাল বিমান যোগে যুদ্ধ বিগ্রহ হইবার সম্ভাবনা অত্যধিক। সেইজন্য বাধ্য হইয়া ভারত গভর্নমেণ্টকে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে এক বিমান-বহর (Indian Air Force) প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে। সম্প্রতি ইউরোপীয় যুদ্ধের জন্য ভারতীয় বিমান-বহর বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হইতেছে।

নবম পরিচ্ছেদ

ফেডারেল্ ব্যবস্থাপক সভা

(The Federal Legislature)

গঠন প্রণালী—বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য গভর্নর জেনারেলকে আইন প্রণয়ন করিবার অধিকার প্রদান করা হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সাধারণত আইন প্রণয়নের দায়িত্ব এক আইনসভার উপর অর্পণ করা হইয়াছে। দুইটি পরিষদ লইয়া আইনসভা গঠিত হইবে। প্রথমটির নাম হইবে ফেডারেল্ সভা (Federal Assembly) এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হইবে রাষ্ট্রীয় পরিষদ (Council of State)। ফেডারেল্ সভার সভ্যসংখ্যা সর্বসমেত ৩৭৫ হইবে। ইহার মধ্যে ব্রিটিশ-ভারত হইতে আসিবেন ২৫০ জন এবং অবশিষ্ট ১২৫ জন করদরাজ্যসমূহ হইতে মনোনীত হইতে পারিবেন। সদস্যসংখ্যার একজনও সরকারী কর্মচারী অথবা সরকারের মনোনীত হইতে পারিবেন না। ব্রিটিশ-ভারতের প্রতিনিধিগণ সকলেই নির্বাচিত হইয়া আসিবেন। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের আপন আপন গভর্নমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হইয়া আসিবেন।

পুরাতন আমলে ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সভ্যগণ প্রাথমিক নির্বাচকমণ্ডলী হইতে নির্বাচিত হইয়া আসিতেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছয় সাতটি জেলা লইয়া এক নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হইত এবং তাহাতে নির্বাচন প্রার্থীদের অসুবিধার অন্ত ছিল না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য স্থির হইয়াছে যে ব্রিটিশ-ভারতের সভ্যগণ আর

প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হইবেন না। প্রতি প্রদেশের সদস্যবৃন্দ পরোক্ষ-ভাবে প্রাদেশিক আইন সভাগুলির সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। তবে এ নির্বাচন পৃথক্‌ভাবে করিতে হইবে। প্রাদেশিক আইনসভার মুসলমান সদস্যগণ ফেডারেল্ সভার মুসলমান সভ্যগণকে, শিখ সদস্যগণ শিখ সভ্যগণকে, এবং সাধারণ (হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি) সদস্যগণ সাধারণ সভ্যগণকে নির্বাচিত করিবেন। ব্রিটিশ-ভারতের কোন্ প্রদেশের এবং কোন্ সম্প্রদায়ের কতজন প্রতিনিধি ফেডারেল্ সভায় থাকিবেন তাহার তালিকা বিশেষভাবে প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ তালিকা অনুসারে সাধারণ সভ্যের সংখ্যা হইবে ১০৫ (তন্মধ্যে অনুন্নত হিন্দুদিগের জন্য ১৯ জন সদস্যের ব্যবস্থা আছে), শিখদিগের ৬, মুসলমানদিগের ৮২, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদিগের ৪, ইউরোপীয়দিগের ৮, ভারতীয় খ্রীষ্টানদিগের ৮, বাণিজ্য এবং শিল্পের প্রতিনিধি সংখ্যা ১১, জমিদারদিগের ৭, মজুরদিগের ১০, এবং স্ত্রীলোকদিগের প্রতিনিধির সংখ্যা ৯ হইবে। প্রদেশ হিসাবে সদস্যসংখ্যা গণনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মাদ্রাজের সভ্যসংখ্যা হইবে ৩৭, বোম্বাইএর ৩০, বাংলার ৩৭, যুক্তপ্রদেশের ৩৭, পঞ্জাবের ৩০, বিহারের ৩০, মধ্যপ্রদেশের ১৫, আসামের ১০, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ৫, উড়িষ্যার ৫. সিন্ধুদেশের ৫, ব্রিটিশ বেলুচিস্থান ১, দিল্লী ২, আজমীড়-মাড়ওয়াড় ১, কুর্গ ১ জন। এতদ্ভিন্ন আরও ৪ জন সদস্য থাকিবে। বাংলার ৩৭ জনের মধ্যে সাধারণ সদস্য ১০ (তন্মধ্যে অনুন্নত হিন্দুদিগের ৩ জন), মুসলমান ১৭ জন, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ১ জন, ইউরোপীয় ১ জন, ভারতীয় খ্রীষ্টান ১ জন, বাণিজ্য এবং শিল্পের প্রতিনিধি ৩ জন, জমিদার ১ জন, মজুর ২ জন এবং স্ত্রীলোক ১ জন। সদস্যগণ সকলেই পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন এবং সদস্যপদ-প্রার্থীদিগের সকলকেই অন্যূন ২৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে সর্বসাকল্যে সভ্যসংখ্যা হইবে ২৬০ জন। তন্মধ্যে ব্রিটিশ-ভারতের নির্বাচিত প্রতিনিধি সংখ্যা হইবে ১৫০ এবং করদরাজ্য-গুলির প্রতিনিধির সংখ্যা হইবে ১০০ জন। অবশিষ্ট ১০ জন গভর্নর জেনারেল মনোনীত করিবেন। ইহাদের ৬ জনকে ব্রিটিশ-ভারত হইতে এবং ৪ জনকে করদরাজ্য হইতে মনোনীত করিবেন। ব্রিটিশ-ভারতের নির্বাচিত সভ্যগণের নির্বাচনের জন্য প্রতি প্রদেশে পদস্থ এবং সম্পত্তি-শালী একদল ব্যক্তিকে ভোটদাতা হিসাবে স্থির করা হইবে। এই ভোটদাতৃগণকে লইয়া কয়েকটি নির্বাচনমণ্ডলী গঠিত করা হইবে। এই মণ্ডলীগুলিই রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যদিগকে নির্বাচিত করিবে। অবশ্য ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্য নির্বাচন পৃথকভাবে হইবে। নির্বাচনকালে সদস্যপদপ্রার্থীদিগের বয়স অন্যূন ৩০ হওয়া প্রয়োজন। ফেডারেল্ সভা এককালীন ৫ বৎসরের জন্য গঠিত হইবে এবং ৫ বৎসর পরে আবার নূতন করিয়া উহা নির্বাচিত হইবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিষদ চিরন্তন, ইহার মৃত্যু নাই। সদস্যগণ ৯ বৎসরের জন্য নির্বাচিত অথবা মনোনীত হইবেন। কিন্তু প্রতি ৩ বৎসর তাঁহাদের সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ অবসর গ্রহণ করিবেন ও পুনর্নির্বাচন অথবা মনোনয়ন দ্বারা তাঁহাদের স্থান পূর্ণ হইবে। এই নিয়ম কার্যকরী করিবার জন্য প্রথমবার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য ৯ বৎসরের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ ৬ বৎসরের জন্য এবং অবশিষ্ট অংশ ৩ বৎসরের জন্য নির্বাচিত অথবা মনোনীত হইবেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ-ভারত হইতে ১৫৬জন সদস্য বিশেষ ভাবে গঠিত নির্বাচনমণ্ডলী হইতে নির্বাচিত হইয়া আসিবেন। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলির ১০০ প্রতিনিধি তাহাদের আপন আপন গভর্নমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হইবেন। ব্রিটিশ-ভারতের ১৫০ জন সদস্যের মধ্যে ২০

জন আসিবেন মাদ্রাজ হইতে, ১৬ জন বোম্বাই হইতে, ২০ জন বাংলা হইতে, ২০ জন যুক্তপ্রদেশ হইতে, ১৬ জন পঞ্জাব হইতে, ১৬ জন বিহার হইতে, ৮ জন মধ্যপ্রদেশ হইতে, ৫ জন আসাম হইতে, ৫ জন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে, ৫ জন উড়িষ্যা হইতে, ৫ জন সিন্ধুপ্রদেশ হইতে, ১ জন ব্রিটিশ বেলুচিস্থান হইতে, ১ জন দিল্লী হইতে, ১ জন আজমীঢ়-মাঢ়োয়াড় হইতে, এবং ১ জন কুর্গ হইতে। এতদ্ভিন্ন ৭ জন হইবেন ইউরোপীয়দিগের এবং ২ জন ভারতীয় খ্রীষ্টানদিগের প্রতিনিধি। বাংলার ২০ জন সদস্যের মধ্যে ৮ জন সাধারণ (হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি), ১ জন অনুন্নত হিন্দু, ১০ জন মুসলমান, এবং একজন মহিলা হইবেন।

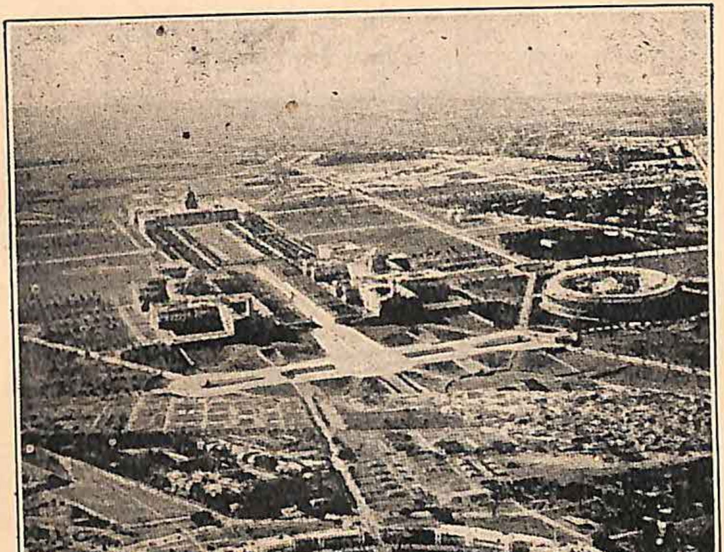
আইন প্রণয়ন—কোন আইন প্রণয়ন করিতে হইলে ঐ বিষয়ে উভয় পরিষদের অনুমোদন প্রয়োজন। সাধারণত আইনের খসড়াটি যে-কোনও পরিষদে প্রথম উপস্থিত করা যাইতে পারিবে। তবে আর্থিক বিষয়ের আইন হইলে উহার খসড়া প্রথমে ফেডারেল্ সভায় উপস্থিত করিতে হইবে। এক পরিষদে গৃহীত হইলে খসড়াটি অপর পরিষদে উপস্থিত করা হইবে। দ্বিতীয় পরিষদে গৃহীত হইবার পরে উহা দস্তখতের জন্য গভর্নর-জেনারেলের নিকট প্রেরিত হইবে এবং এইরূপে তাঁহার অনুমোদন পাইলে খসড়াটি আইনে পরিণত হইবে। তবে তিনি দস্তখত না করিয়া খসড়াটি নামঞ্জুরও করিতে পারেন। যদি এক পরিষদে গৃহীত খসড়া অপর পরিষদে অগ্রাহ্য হয়, অথবা আশাতীতভাবে পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলে গভর্নর-জেনারেল দুই পরিষদের এক মিলিত সভা আহ্বান করিতে পারেন এবং এই মিলিত সভার সিদ্ধান্তের উপরে আইনটির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে।

বাজেট—প্রতি বৎসরের প্রথমে আগামী ১২ মাসের ফেডারেল্ গভর্নমেণ্টের কত টাকা আদায় এবং খরচ হইতে পারে এ বিষয়ে

অর্থ-সচিব ফেডারেল্ আইনসভার নিকট এক বিবৃতি উপস্থিত করিবেন। এইরূপে যে বাজেট দাখিল করা হইবে তাহাতে ব্যয়ের বিষয়গুলি দুইভাগে বিভক্ত থাকিবে। গভর্নর-জেনারেল, মন্ত্রিগণ, ফেডারেল্ কোর্টের বিচারপতি, অ্যাডভোকেট জেনারেল প্রভৃতি উচ্চ কর্মচারীদের বেতন দিবার জন্য যে খরচ করা হইবে তাহার জন্য আইনসভার কোন অনুমতির প্রয়োজন হইবে না। সেইরূপ সমর-বিভাগ এবং পররাষ্ট্র-বিভাগ প্রভৃতি পরিচালনার জন্য যে অর্থব্যয় হইবে তাহা আইনসভার অনুমতি না লইয়াই করা যাইতে পারিবে।

কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে খরচ করিতে হইলে প্রথমে ফেডারেল্ সভার (Assembly) নিকট অনুমতি চাহিতে হইবে। ঐ সভায় এই অনুমতি পাইলে বিষয়টি রাষ্ট্রীয় পরিষদের (Council of State) নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। সেখানেও এইরূপ অনুমতি পাইলে খরচ করা গভর্নমেণ্টের পক্ষে আইনসঙ্গত হইবে। যদি ফেডারেল্ সভা অনুমতি প্রদান না করেন তাহা হইলেও গভর্নমেণ্ট ইচ্ছা করিলে বিষয়টিকে রাষ্ট্রীয় পরিষদের নিকট উপস্থিত করিতে পারিবেন। তবে খরচ করিতে অনুমতি দিবার ব্যাপারে দুই পরিষদের মতানৈক্য হইলে একটি মিলিত সভা আহ্বান করা যাইতে পারিবে এবং এই মিলিত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্য করিতে হইবে। এরূপ হইতে পারে যে, গভর্নমেণ্ট যে সকল খরচের জন্য অনুমতি চাহিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অথবা কতক পরিমাণে অগ্রাহ্য হইয়াছে। এমতাবস্থায় গভর্নর-জেনারেল যদি মনে করেন যে ঐ খরচ তাঁহার বিশেষ দায়িত্বপালনের জন্য প্রয়োজন তাহা হইলে আইনসভার বিনা অনুমতিতেই তিনি উহা করিতে পারিবেন।

অর্থকরী আইন প্রণয়ন (Finance Bill) —পূর্বে আইন প্রণয়ন করিবার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহা এখন বলা প্রয়োজন যে,



এরোপ্লেন হইতে নয়া দিল্লীর দৃশ্য

কর স্থাপন অথবা বৃদ্ধি করিবার জন্য যে আইনের প্রয়োজন হইবে উহার খসড়া প্রথমে ফেডারেল্ সভায় উপস্থিত করিতে হইবে। গভর্নমেণ্টকে অনেক সময় ঋণ করিয়া টাকা তুলিতে হয়। কিন্তু ইহার জন্য নিয়মকানুন থাকা প্রয়োজন। এই নিয়মকানুন প্রস্তুত করিবার জন্য যে আইন প্রণয়নের দরকার হইবে উহার খসড়াও প্রথমে ফেডারেল্ সভার নিকট পেশ করিতে হইবে। সাধারণ আইন প্রণয়ন ব্যাপারে আইনসভার যে-কোন সভ্য একটি খসড়া উপস্থিত করিতে পারেন। কিন্তু উপরিউক্ত বিষয়ে কোন আইন প্রণয়ন করিতে হইলে উহার খসড়া একমাত্র গভর্নমেণ্টই (অর্থাৎ মন্ত্রীদের মধ্যে কেহ) উপস্থিত করিতে পারিবেন। বেসরকারী সভ্যদের ঐ খসড়া উপস্থিত করিবার অধিকার থাকিবে না।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট ও গভর্নরের ক্ষমতা

ভারতবর্ষের প্রদেশসমূহ—পূর্ব আমলে ব্রিটিশ-ভারতে সর্বসমেত দশটি গভর্নরশাসিত প্রদেশ ছিল ; তন্মধ্যে ব্রহ্মদেশকে এখন ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। কিন্তু এইভাবে প্রদেশগুলির সংখ্যা হইতে একটি কমিয়া গেল বটে, কিন্তু অপরদিকে তুইটি নূতন প্রদেশ গড়িয়া উঠিল। এতদিন বিহার এবং উড়িষ্যা মিলিয়া একটি প্রদেশ গঠিত ছিল ; এখন উড়িষ্যা স্বতন্ত্র বলিয়া গণ্য হইয়াছে। সিন্ধুদেশওবোম্বাই প্রদেশহইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি পৃথক্ প্রদেশ হইয়াছে। সুতরাং নূতন আমলে সর্ব শুদ্ধ ১১টি গভর্নর-শাসিত প্রদেশ থাকিবে—যথা, আসাম, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশ। এই ১১টি গভর্নর-শাসিত প্রদেশ ছাড়া আরও কয়েকটি চীফ্-কমিশনার শাসিত প্রদেশ থাকিবে—যথা, ব্রিটিশ বেলুচি-স্থান, দিল্লী, আজমীঢ়-মাঢ়োয়াড়, কুর্গ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। শেষোক্ত প্রদেশগুলির শাসনভার গভর্নর-জেনারেলের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে এবং তিনি তাঁহার ইচ্ছামত নিযুক্ত (appointed by him in his discretion) এক একজন চীফ্-কমিশনারের সাহায্যে ঐগুলির শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারিবেন।

গভর্নর ও তাঁহার বিশেষ দায়িত্বসমূহ—পূর্বকথিত ১১টি প্রদেশে একজন করিয়া গভর্নর নিযুক্ত থাকিবেন। তিনি সাধারণত পাঁচ বৎসরের জন্যই শাসনভার গ্রহণ করিবেন। আশা করা যায়, পূর্বে যেমন বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে সাধারণত ইংলণ্ড হইতে গভর্নর নিযুক্ত করিয়া পাঠান হইত, নূতন আমলেও সেই নিয়ম বজায় থাকিবে এবং অন্যান্য প্রদেশে পূর্বের ন্যায় ভারতীয় সিভিল সার্ভিস হইতে গভর্নর মনোনীত করা হইবে।

প্রত্যেক গভর্নরের একটি করিয়া মন্ত্রি-পরিষদ (Council of Ministers) থাকিবে এবং প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের সমস্ত বিভাগগুলি ঐ পরিষদের কর্তৃত্বাধীন হইবে। কিন্তু মন্ত্রিগণের হস্তে কার্যভার অর্পিত থাকিলেও অনেক বিষয়ে গভর্নরের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকিবে। কেন্দ্রীয় শাসনব্যাপারে যেমন কতকগুলি বিষয়ে গভর্নর-জেনারেলের উপর বিশেষ দায়িত্বভার (special responsibilities) অর্পণ করা হইয়াছে সেইরূপ প্রদেশগুলিতেও কতকগুলি বিষয় গভর্নরের বিশেষ কর্তৃত্বাধীন করা হইয়াছে। প্রদেশে শান্তিভঙ্গের গভীর আশঙ্কা দূর করিবার জন্য, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, বেতন, পেনসন, পদোন্নতি প্রভৃতি সম্বন্ধে সিভিল-সার্ভিসগুলির ন্যায্য অধিকার বজায় রাখিবার জন্য, শাসনসংস্কারের বহির্ভূত স্থানগুলির শান্তি এবং সুশাসন বজায় রাখিবার জন্য এবং করদ রাজ্যের অধিকারগুলি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য গভর্নর ইচ্ছামত প্রয়োজনীয় ক্ষমতার ব্যবহার করিতে পারিবেন।

গভর্নরের আইন ও অর্ডিনান্স প্রণয়ন—উপরিউক্ত দায়িত্ব পালন করিতে হইলে অনেক সময় গভর্নরকে প্রয়োজনমত আইন প্রণয়ন করিতে হইতে পারে। ঐ আইন প্রণয়ন প্রাদেশিক আইনসভার

অনুমতিসাপেক্ষ হইবে না। গভর্নর ইচ্ছা করিলে আইনসভাকে কিছু না বলিয়াই এই বিষয়ে কোন আইন প্রণয়ন এবং তাহা ঘোষণা করিতে পারিবেন। আবার ইচ্ছা করিলে ঐ আইনের খসড়াটি (bill) আইন-সভার নিকট উপস্থিত করিয়া উহার আলোচনার ব্যবস্থা করিতে পারেন। তবে আলোচনার ধারা অনুসারে তাঁহাকে খসড়াটির পরিবর্তন করিতে হইবে এরূপ কোন শর্ত নাই। আইনসভার নিকট খসড়াটি পাঠাইবার এক মাসের মধ্যে তিনি পরিবর্তিত অথবা অপরিবর্তিত আকারে উহাকে আইনে পরিণত করিতে পারিবেন। অনেক সময় এ বিষয়ে কোন স্থায়ী আইন প্রণয়নের কোন প্রয়োজন না হইতে পারে। কোন অস্থায়ী আইন পাশ হইলেই দায়িত্বপালন করা যাইতে পারে। এরূপ স্থলে গভর্নর এককালীন ছয় মাসের জন্য একটি অর্ডিনান্স (ordinance) পাশ করিতে পারিবেন এবং দরকার হইলে উহা পুনরায় ছয় মাসের জন্য কার্যকরী রাখিতে পারিবেন। বিশেষ দায়িত্বপালনের জন্য তিনি যেমন প্রয়োজনমত আপনার ইচ্ছা অনুসারে স্থায়ী অথবা অস্থায়ীভাবে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন সেইরূপ প্রয়োজনমত আইনসভার অনুমতি না লইয়া এবং অনেক সময় উহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অর্থসংগ্রহ এবং ব্যয় করিতে পারিবেন।

গভর্নরের উপরিউক্ত দায়িত্বগুলি বিশেষ গুরুতর বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন। এই দায়িত্বপালন করিতে গিয়া যে ক্ষমতার ব্যবহার করিতে হইবে তাহাও কম ব্যাপক হইবে না। বাস্তবিক, নূতন শাসনতন্ত্রে গভর্নরের দায়িত্বভার এত বৃদ্ধি পাইবে এবং তাঁহার কার্যক্ষেত্র এত বিস্তৃত হইবে যে, এক সময় অনেকে মনে করিয়াছিলেন তাঁহার একজন সহকারী গভর্নর নিযুক্ত করা প্রয়োজন হইতে পারে। এই প্রস্তাব গৃহীত না হইলেও সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, পূর্বের ন্যায়

কেবল প্রাইভেট সেক্রেটারীর সাহায্য লইয়া তাঁহার এই গুরুতর দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং এখন স্থির হইয়াছে যে, গভর্নরের আপন দপ্তরখানা পরিচালনার জন্য একজন অভিজ্ঞ এবং প্রাচীন সিভিলিয়ানকে সেক্রেটারী হিসাবে নিযুক্ত করা হইবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও প্রাদেশিক মন্ত্রি-পরিষদ

প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য (Provincial Autonomy) বর্তমান শাসন-সংস্কারের একটি মূল নীতি। এই স্বাতন্ত্র্যের অর্থ ইহা নহে যে প্রদেশগুলি সর্বতোভাবে স্বাধীনতা লাভ করিবে এবং তাহাদের সমুদয় শাসনকার্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়াই সম্পন্ন হইবে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, শাসনকার্যের কতকগুলি অংশ কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এই সকল অংশের উপর প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের কোনই অধিকার নাই। আর কতকগুলি ইহার হাতে ন্যস্ত। প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য দ্বারা বাস্তবিক ইহাই বুঝিতে হইবে যে, শেষোক্ত বিষয়গুলির উপর প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের অপ্রতিহত প্রভুত্ব থাকিবে। কিন্তু এই সংকীর্ণ এবং অপরিসর ক্ষেত্রেও প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের কর্তৃত্ব সর্বতোভাবে অব্যাহত নহে। আমরা দেখিয়াছি যে, বিশেষ দায়িত্বপালনের জন্য গভর্নরের হস্তে প্রভূত ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। এই ক্ষমতা ব্যবহারের ব্যাপারে গভর্নরকে সম্পূর্ণভাবে গভর্নর-জেনারেলের অধীন থাকিতে হইবে। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, প্রাদেশিক ব্যাপারে বাহিরের কর্তৃপক্ষ-দিগের অনেকখানি অধিকার রহিয়াছে। অতএব ইহা বলিতে হইবে যে, বর্তমান শাসন-সংস্কারে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

প্রাদেশিক বিভাগগুলির পরিচালনার ভার এক মন্ত্রি-পরিষদের (Council of Ministers) উপর অর্পণ করা হইয়াছে। মন্ত্রিগণের সংখ্যা নির্দিষ্ট হয় নাই। প্রয়োজনমত তাঁহাদের সংখ্যা নিরূপিত হইবে। গত চারি বৎসরে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সংখ্যক মন্ত্রী নিয়োগ করা হইয়াছে। মন্ত্রিগণকে গভর্নর নিযুক্ত করিবেন। আইনসভার সদস্যদিগের মধ্য হইতেই মন্ত্রিগণ নিযুক্ত হইবেন। যদি ঐ সভার বাহির হইতে কাহাকেও মন্ত্রিপদে মনোনীত করা হয় তাহা হইলে ছয় মাসের মধ্যে ঐ মন্ত্রীকে আইনসভায় সভ্য হইতে হইবে, নতুবা তাঁহাকে মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিতে হইবে। মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত করিবার সময় গভর্নরকে মনে রাখিতে হইবে যে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির মন্ত্রি-পরিষদে স্থান পাওয়া প্রয়োজন। প্রথমত গভর্নর একজন প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিবেন এবং পরে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া অপর মন্ত্রীদিগকে মনোনীত করিবেন।

মন্ত্রিগণের মনোনয়ন যেমন গভর্নরের ইচ্ছার উপর অনেকখানি নির্ভর করিবে, সেইরূপ তাঁহাদের কার্যে বহাল থাকাও অনেক পরিমাণে গভর্নরের উপর নির্ভর করিবে। গভর্নর ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে মন্ত্রিপদ হইতে অপসৃত করিতে পারিবেন। গভর্নরের সহিত মন্ত্রিগণের এইরূপ প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক হইলেও সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা প্রয়োজন যে, মন্ত্রিগণ তাঁহাদের বিভাগগুলির পরিচালনার জন্য আইনসভার নিকটেও জবাবদিহি করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। আইনসভার বিশ্বাস হারাইলে তাঁহাদিগের মন্ত্রিত্ব বজায় রাখা কঠিন হইবে। বস্তুত তাঁহাদের কার্যে বহাল থাকিবার বিরুদ্ধে কোনও প্রস্তাব আইনসভায় গৃহীত হইলে তাঁহাদিগকে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে হইবে। যদিও এইভাবে মন্ত্রিগণ প্রাদেশিক বিভাগগুলির পরিচালনার জন্য আইনসভার নিকট জবাব-

দিহি করিতে বাধ্য থাকিবেন, তথাপি বলা নিষ্প্রয়োজন যে গভর্নর তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁহাদিগের বিভাগীয় কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রাদেশিক আইনসভা ও প্রতিনিধি নির্বাচন-রীতি

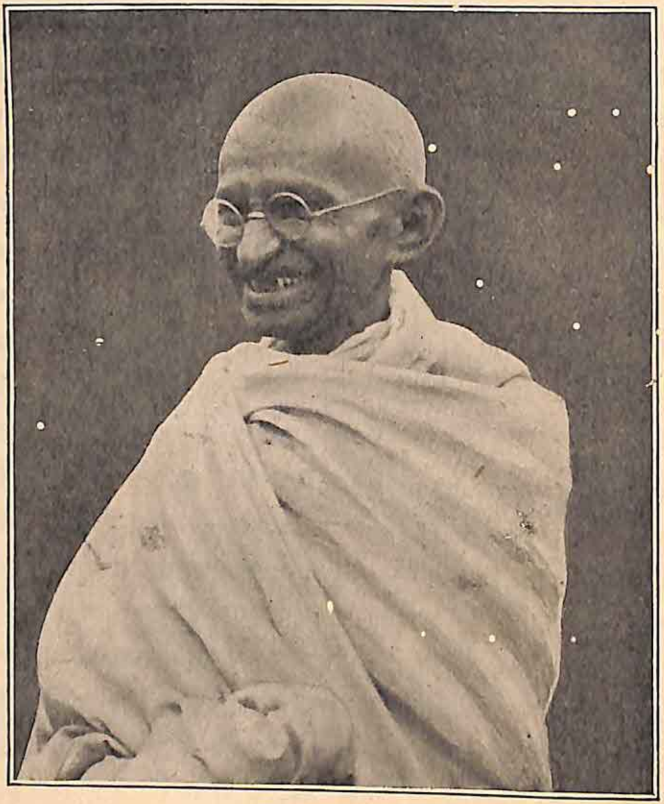
আইন করিবার জন্য এবং মন্ত্রি-পরিষদের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করিবার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া আইনসভা গঠিত হইয়াছে। অবশ্য অস্থায়ীভাবে আইন-প্রণয়ন করিবার অধিকার গভর্নরের থাকিবে। পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, বিশেষ দায়িত্বপালনের জন্য স্থায়ী এবং অস্থায়ীভাবে গভর্নর স্বীয় মতানুসারে আইন পাশ করিতে পারিবেন। এখন বলা প্রয়োজন যে সাধারণ ব্যাপারেও আইনসভার অনুপস্থিতিতে হঠাৎ কোন নূতন আইনের প্রয়োজন হইলে গভর্নর সাময়িকভাবে অর্ডিনান্স পাশ করিতে পারিবেন। তবে আইনসভা বসিবামাত্রই উহার নিকট অর্ডিনান্সটি উপস্থিত করিতে হইবে। আইনসভা ইচ্ছা করিলে অবিলম্বে উহার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়া উহা নাকচ করিতে পারিবে। ঐরূপ কোন অভিমত প্রকাশিত না হইলে আইনসভা বসিবার ছয় সপ্তাহ পরে অর্ডিনান্সটি বাতিল হইয়া যাইবে।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা ও পরিষদ—মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কারের স্থিতিকালে প্রদেশগুলির আইনসভা সর্বত্রই একটি পরিষদ লইয়া গঠিত ছিল। কিন্তু নূতন সংস্কার প্রবর্তনের অনেক পূর্ব হইতেই

দেশের একদল লোক যাহাতে নূতন আমলে প্রাদেশিক আইনসভায় একটি দ্বিতীয় পরিষদ (second chamber) থাকে তাহার জন্য দাবী করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ধারণা হইল যে, কেবল এক পরিষদ লইয়া আইনসভা গঠিত হইলে সহসা এরূপ আইন পাশ হইতে পারে যাহা দ্বারা অনেকের অন্যায়ভাবে স্বার্থহানি ঘটিবে। সাধারণ জমিদার, তালুকদার, চা-বাগানের কর্তৃপক্ষ, ইউরোপীয় এবং অন্যান্য বিত্তশালী ব্যক্তিগণ এই প্রস্তাবের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে লাগিলেন। ফলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট স্থির করিলেন যে বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, আসাম, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের আইনসভাগুলি দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইবে। অবশিষ্ট প্রদেশগুলিতে আইনসভাগুলি পূর্বের ন্যায় একটি পরিষদ লইয়াই গঠিত থাকিবে। প্রথম বা নিম্ন পরিষদগুলিকে ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Assembly) বলা হইবে এবং দ্বিতীয় পরিষদগুলি ব্যবস্থাপক পরিষদ (Legislative Council) নামে পরিচিত হইবে। ব্যবস্থাপক সভা ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবে এবং ব্যবস্থাপক পরিষদের সভ্যগণ সাধারণত ৯ বৎসরের জন্য নির্বাচিত অথবা মনোনীত হইবেন। ব্যবস্থাপক পরিষদ কখনও সম্পূর্ণ নূতন করিয়া গঠিত হইবে না। উহাকে চিরন্তন বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। তবে ইহার সদস্যদিগের এক-তৃতীয়াংশ তিন বৎসর অন্তর অবসর লইবেন এবং তাঁহাদের স্থানে ঐ সময় পুনরায় নির্বাচন অথবা মনোনয়ন হইবে। এই নিয়ম প্রবর্তিত করিবার জন্য ব্যবস্থাপক পরিষদ প্রথম গঠিত হইবার সময় উহার সদস্যদিগের এক-তৃতীয়াংশ ৯ বৎসরের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ ৬ বৎসরের জন্য এবং অবশিষ্টাংশ ৩ বৎসরের জন্য নির্বাচিত অথবা মনোনীত হইবেন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা—বিভিন্ন প্রদেশে আইনসভাগুলিতে

কতজন সদস্য থাকিবে, তাঁহাদের কত অংশ কোন্ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হইয়া আসিবে এবং এই প্রতিনিধিগণ কিভাবে নির্বাচিত হইবেন,



মহাত্মা গান্ধী

ঐই প্রশ্নগুলির মীমাংসা ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় (Communal Award) করিয়াছিলেন।

কথা ছিল, রাউণ্ড টেবিল্ বৈঠকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ এ বিষয়ে এক সর্ববাদীসম্মত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ মতানৈক্য হওয়ায় এই ব্যাপারের কোন মীমাংসা সম্ভব হইল না। তখন এই প্রতিনিধিগণ স্থির করিলেন যে, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের হস্তে এই মীমাংসার ভার অর্পণ করা হউক। তদনুসারে ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেব উপরিউক্ত বাঁটোয়ারার বন্দোবস্ত করিয়া ভারতে প্রকাশিত করিলেন। বাঁটোয়ারায় অনুন্নত হিন্দুদিগের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী তখন পুণায় যারবেদা জেলে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি এই সম্পূর্ণ পৃথক্ নির্বাচনের ব্যবস্থা দেখিয়া অতীব ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহার মনে হইল ইহাতে হিন্দুসমাজের অঙ্গচ্ছেদ হইবে। সুতরাং এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইয়া অনশনব্রত আরম্ভ করিলেন। ইহাতে দেশময় এক মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। দেশের নেতৃগণ অনুন্নত হিন্দুদিগের অন্যতম প্রতিনিধি ডাঃ আম্বেদকারের নিকট উপস্থিত হইয়া এ বিষয়ে বাঁটোয়ারার পরিবর্তনের জন্য আবেদন করিলেন। অনেক আলোচনার পর এই সম্পর্কে তাঁহার সহিত একটি রফা হইল; ইহাই 'পুণা চুক্তি' (Poona Pact) বলিয়া পরিচিত। এই চুক্তি অনুসারে বাঁটোয়ারার কিছু পরিবর্তন হইল। এই পরিবর্তিত বাঁটোয়ারা ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের শাসনসংস্কারের অঙ্গীভূত হইয়াছে।

বাংলার ব্যবস্থাপক সভার গঠন—এই বাঁটোয়ারা অনুসারে বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় সর্বসমেত ২৫০ জন সদস্য আছেন। তন্মধ্যে সাধারণের প্রতিনিধি ৭৮ জন (ইহার মধ্যে ৩০ জন অনুন্নত হিন্দুদিগের প্রতিনিধি), মুসলমানদিগের ১১৭ জন, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ৩ জন,

ইউরোপীয়ান ১১ জন, ভারতীয় খ্রীষ্টান ২ জন, ব্যবসায়-শিল্প প্রভৃতির প্রতিনিধি ১৯ জন, জমিদারদিগের প্রতিনিধি ৫ জন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ২ জন, মজুরদিগের প্রতিনিধি ৮ জন, সাধারণ মহিলাদিগের প্রতিনিধি ২ জন, মুসলমান মহিলাদিগের প্রতিনিধি ২ জন, এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলাদিগের প্রতিনিধি ১ জন।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সভ্যগণকে নির্বাচিত করিবার জন্য তাঁহাদের আপন আপন সম্প্রদায়ভুক্ত ভোটারদিগকে লইয়া নির্বাচনমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। মুসলমান প্রতিনিধিগণ মুসলমান নির্বাচনমণ্ডলী হইতে নির্বাচিত হন। এই নিয়ম অপর সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধি নির্বাচনেও প্রযোজ্য। অনুন্নত শ্রেণীর প্রতিনিধি-নির্বাচনে এই নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই শ্রেণীগুলিকে হিন্দুসমাজ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিবার বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী দাঁড়াইয়া ছিলেন। পুণা চুক্তি অনুসারে ইহাদিগের প্রতিনিধি-নির্বাচনের যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ পৃথক্ বলা যায় না। কোন অঞ্চল হইতে একজন অনুন্নত শ্রেণীর প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে হইলে প্রথমে ঐ অঞ্চলের অনুন্নত শ্রেণীর ভোটদাতৃগণ ৪ জন নির্বাচনপ্রার্থী নির্বাচিত করেন। ইহাই প্রাথমিক নির্বাচন। এই প্রাথমিক নির্বাচনের ফলে ৪ জন নির্বাচনপ্রার্থী মনোনীত হইবার পরে, তাঁহাদের মধ্যে একজন, ঐ অঞ্চলের অনুন্নত শ্রেণীর এবং উচ্চ শ্রেণীর ভোটারদিগকে লইয়া সম্মিলিত নির্বাচনমণ্ডলীর দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। এই ব্যবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে জটিল হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই নিয়ম অনুসারে অনুন্নত শ্রেণীর প্রতিনিধি-পদপ্রার্থীদিগের দুইবার নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। তবে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনের সময় প্রাথমিক নির্বাচনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন প্রতিযোগিতা হয় নাই। বিনা দ্বন্দ্বেই

অধিকাংশ অঞ্চলে ৪ জন অনুন্নত শ্রেণীর নির্বাচন-প্রার্থী মনোনীত হইয়াছিলেন।

প্রধান মন্ত্রীর বাঁটোয়ারা সকলের মনঃপূত হয় নাই। প্রথমত, যে পৃথক্ নির্বাচনের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা জাতীয়তা বিরোধী বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু আবার সাম্প্রদায়িকতাবাদিগণের ধারণা যে, পৃথক্ নির্বাচনের ব্যবস্থা না থাকিলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে পারিবে না এবং তাহাতে সমাজের অকল্যাণ হইবে। প্রতিনিধি সংখ্যা যেরূপভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে বাংলার হিন্দুগণ বিশেষভাবে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন্। তাঁহারা মনে করেন যে তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। অনুন্নত শ্রেণীর জন্য ৩০ জন প্রতিনিধি স্থির করার বিরুদ্ধেও তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অনুন্নত শ্রেণীর সংখ্যা বাংলায় অধিক নহে। এই কারণে প্রধান মন্ত্রী প্রথমে যে বাঁটোয়ারা করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ শ্রেণীগুলির জন্য ১০ জন প্রতিনিধির ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পুণায় যে রফা হইল তাহাতে হঠাৎ এই প্রতিনিধির সংখ্যা ১০ হইতে ৩০এ পরিণত হইয়াছে।

ভোটদাতৃগণের সংখ্যা নূতন শাসনসংস্কারে অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাঁহারা বাৎসরিক ছয় আনা চৌকিদারী ট্যাক্স দিয়া থাকেন, যাঁহারা ইন্‌কম ট্যাক্স দিয়া থাকেন, যাঁহারা মোটর গাড়ীর জন্য ট্যাক্স দিয়া থাকেন, এবং যাঁহারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ভোট দিবার অধিকারী।

বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদ (Legislative Council)—ব্যবস্থাপক পরিষদের সভ্যসংখ্যা ৬৩র কম এবং ৬৫র বেশি হইবে না। এই সংখ্যার মধ্যে সাধারণ প্রতিনিধি ১০ জন, মুসলমান ১৭ জন,

ইউরোপীয় ৩ জন এবং ব্যবস্থাপক সভা হইতে নির্বাচিত ২৭ জন। অবশিষ্ট ৬ বা ৮ জন গভর্নর মনোনীত করেন। সাধারণ, মুসলমান এবং ইউরোপীয়দিগের প্রতিনিধিগণ পৃথক্‌ভাবে নিজেদের সম্প্রদায়ভুক্ত ভোটদাতৃগণকে লইয়া গঠিত নির্বাচনমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হন। এই ভোটারদিগের যোগ্যতা সম্বন্ধে গভর্নমেণ্ট যে ব্যবস্থা করিয়াছেন



ব্যবস্থাপক সভাগৃহ, কলিকাতা

তাহাতে অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী ব্যক্তিগণই দ্বিতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভা হইতে যে ২৭ জন নির্বাচিত হন তাঁহাদের নির্বাচন প্রণালী বিভিন্ন রকমের; ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ 'Single Transferable Vote' দ্বারা উহাদিগকে নির্বাচিত করেন। ইহাতে আশা করা যায় এই নির্বাচনে সকল সম্প্রদায়ের উপর সুবিচার হইবে।

আইন প্রণয়ন—কোন আইন পাশ করিতে হইলে উহার খসড়াটি

(bill) উভয় পরিষদেই গৃহীত হইতে হইবে এবং তৎপরে গভর্নরের অনুমোদন পাইতে হইবে। গভর্নর ইচ্ছা করিলে উহা অনুমোদন না করিয়া নাকচ করিয়া দিতে পারিবেন, ইচ্ছা করিলে আবার উহা গভর্নর জেনারেলের অনুমোদনের জন্য স্থগিত রাখিতে পারেন। আর্থিক ব্যাপারের বিল ভিন্ন অন্য যে কোনও বিল ব্যবস্থাপক সভা বা পরিষদে প্রথম উপস্থিত করা যাইতে পারে। কেবল আর্থিক ব্যাপার সম্পর্কীয় বিলগুলি ব্যবস্থাপক সভায় প্রথম উপস্থিত করিতে হইবে। এক পরিষদ হইতে কোনও বিল পাশ হইলে অপর পরিষদের নিকট উহা প্রেরিত হইবে। এই দ্বিতীয় পরিষদে উহা আশাতীতভাবে পরিবর্তিত অথবা একেবারে অগ্রাহ্য হইলে এবং উহা লইয়া দুই পরিষদে সংঘর্ষ বাধিলে গভর্নর তাহাদের এক সম্মিলিত সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। এই সম্মিলিত সভার সিদ্ধান্তের উপর বিলটির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে।

বাৎসরিক আয়ব্যয়ের বিবৃতি ও বাজেট—প্রতি বৎসরের প্রথমে ঐ বৎসর প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের আনুমানিক কত টাকা আদায় এবং খরচ হইতে পারে সে বিষয়ে অর্থসচিব আইনসভার নিকট এক বিবৃতি উপস্থিত করিবেন। ফেডারেল্ গভর্নমেণ্টের বাজেটের ন্যায় প্রাদেশিক বাজেটেও ব্যয়ের বিষয়গুলি দুই ভাগে বিভক্ত থাকিবে। গভর্নর, মন্ত্রিগণ এবং হাইকোর্টের বিচারপতিদিগের বেতন দিবার জন্য যে খরচ করিবার প্রয়োজন হইবে তাহা আইনসভার অনুমতিসাপেক্ষ হইবে না। সেইরূপ গভর্নরের আপন দপ্তরখানা পরিচালনা করিবার খরচ এবং প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের দেনা পরিশোধ করিবার জন্য খরচও আইনসভার অনুমতি না লইয়াই করা যাইতে পারিবে।

কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে খরচ করিতে হইলে গভর্নমেণ্টকে ব্যবস্থাপক সভার অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টে এইরূপ

খরচের জন্য আইনসভার উভয় পরিষদেরই অনুমতি প্রয়োজন হইবে। কিন্তু প্রদেশগুলিতে কেবলমাত্র ব্যবস্থাপক সভার (Legislative Assembly) অনুমতি পাইলেই চলিবে। বস্তুত ব্যবস্থাপক পরিষদের (Legislative Council) এই অর্থব্যয়ের উপর কোন অধিকার থাকিবে না। ঐ অধিকার নিম্ন পরিষদেরই একচেটিয়া হইবে। ব্যবস্থাপক সভা ইচ্ছা করিলেই গভর্নমেণ্টের কোন খরচের দাবী নামঞ্জুর করিতে অথবা কমাইয়া দিতে পারিবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই অর্থব্যয় যদি গভর্নরের কোনও বিশেষ দায়িত্বপালনের জন্য প্রয়োজন হয় তাহা হইলে ব্যবস্থাপক সভার আপত্তি সত্ত্বেও গভর্নর ঐ অর্থব্যয় করিতে পারিবেন। ইহা বলা প্রয়োজন যে গভর্নমেণ্ট কোন খরচ করিবার দাবী না করিলে ঐ অর্থব্যয় সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভা কোন অনুমতি দিতে পারিবেন না।

অর্থকরী আইন প্রণয়ন (Finance Bill)—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আর্থিক ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করিবার সময় উহার খসড়াটি প্রথমে ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিতে হইবে। ব্যবস্থাপক সভা উহার আলোচনা এবং ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবার পূর্বে ব্যবস্থাপক পরিষদ উহার আলোচনা করিতে পারিবে না। সুতরাং এখন বলা নিষ্প্রয়োজন যে, কর স্থাপন অথবা বৃদ্ধি করিবার জন্য যে-সকল আইনের দরকার হইবে সেগুলির খসড়া প্রথমে ব্যবস্থাপক সভার নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। এই খসড়াগুলি ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হইলে দ্বিতীয় পরিষদের নিকট ঐগুলি পেশ করা হইবে এবং ঐগুলি পূর্ণাঙ্গ আইনে পরিণত হইতে হইলে এই দ্বিতীয় পরিষদের অনুমোদন এবং গভর্নরের দস্তখত পাইতে হইবে। যদি দুই পরিষদে মতানৈক্য ঘটে তাহা হইলে গভর্নর অবিলম্বে উহাদের সম্মিলিত সভা আহ্বান করিতে

পারিবেন। সাধারণ আইন প্রণয়ন ব্যাপারে আইনসভার যে-কোন সভ্য একটি বিল আনয়ন করিতে পারিবেন। কিন্তু আর্থিক ব্যাপারে একমাত্র গভর্নমেণ্টই কোন বিল উপস্থিত করিতে পারিবেন। বেসরকারী সভ্যদিগের ঐ অধিকার থাকিবে না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জেলা শাসন প্রণালী

শাসনকার্যের সুবন্দোবস্তের জন্য মাদ্রাজ ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশগুলি প্রথমত কয়েকটি "ডিভিশনে" বা বিভাগে বিভক্ত। বাংলাদেশে সর্ব-সমেত ৫টি ডিভিশন আছে (প্রেসিডেন্সি, বর্দ্ধমান, রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম)। প্রত্যেকটি বিভাগ কয়েকটি জেলায় বিভক্ত। মাদ্রাজে বিভাগ বলিয়া কোন শাসন কেন্দ্র নাই। ঐ প্রদেশটি প্রথমতই কতকগুলি জেলায় বিভক্ত। বাংলার জেলাগুলির সংখ্যা বর্তমানে ২৭। কিছুদিন পূর্বে প্রায় স্থির হইয়াছিল যে মৈমনসিংহ ও মেদিনীপুর অত্যধিক বিস্তৃত বলিয়া ঐ দুইটি জেলাকে ভাঙিয়া চারিটি করা হইবে। কিন্তু বর্তমানে ঐ প্রস্তাব স্থগিত আছে। প্রত্যেকটি জেলা কতকগুলি মহকুমায় বিভক্ত। কয়েকটি প্রদেশে আবার এক একটি মহকুমা কয়েকটি তহশীলে বিভক্ত। কিন্তু বাংলায় মহকুমার নীচে কোন ছোট বিভাগ নাই। তবে আমরা পরে দেখিতে পাইব যে কয়েকটি ইউনিয়ন মিলিয়া এক একটি সার্কল গঠিত আছে। এক একটি মহকুমায় সাধারণত দুইটি সার্কল দেখিতে পাওয়া যায়। এই ইউনিয়ন এবং সার্কল গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন কার্যের জন্যই প্রধানত গঠিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ সার্কল পরিদর্শনের জন্য যে কর্মচারী নিযুক্ত থাকেন তাঁহার দ্বারা সাধারণ শাসনকার্যেরও অনেক সুবিধা হইয়া থাকে।

বিভাগ ও কমিশনার—প্রতি বিভাগে একজন করিয়া কমিশনার নিযুক্ত থাকেন। সাধারণত তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ কর্মচারী। দুই এক স্থলে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস হইতেও কোন কোন কর্মচারীরা কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। মোটামুটিভাবে কমিশনার তাঁহার বিভাগের শান্তিরক্ষা প্রভৃতি সাধারণ শাসনকার্যের সুবন্দোবস্তের জন্য দায়ী। তবে বর্তমানে গভর্নমেণ্টের খাজনা আদায় এবং ঐ সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্য করিবার জন্য কমিশনারকে অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকিতে হয়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির উপরও বহুল পরিমাণে কর্তৃত্ব কমিশনারকে করিতে হয়। সুতরাং শান্তিরক্ষার দায়িত্ব তিনি বিশেষভাবে বহন করিতে পারেন না। তবে এই বিষয়েও তাঁহার কর্তৃত্ব এবং প্রাধান্য যে একেবারেই নাই তাহা বলা চলে না।

জেলা ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট—প্রত্যেক জেলার উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্য একজন করিয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত থাকেন। কোন্ কোন জেলায় এক বা ততোধিক অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও থাকেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একাধারে খাজনা আদায়ের জন্য, শান্তিরক্ষার জন্য, আব্‌গারী প্রভৃতি বিভাগ পরিদর্শনের জন্য, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠান-গুলির তত্ত্বাবধানের জন্য এবং ফৌজদারী নিম্ন আদালতগুলির পরিদর্শন ও স্বয়ং ফৌজদারী বিচার করিবার জন্য দায়ী। যে সকল জেলায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত থাকেন তথায় ফৌজদারী আদালত-গুলির পরিদর্শন, ফৌজদারী বিচারকার্য এবং অন্যান্য দুই চারিটি বিষয় এই কর্মচারীর উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অবশ্য অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাধারণত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তৃত্বাধীনে এই সকল কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

জেলায় শান্তিরক্ষার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গভর্নমেণ্টের নিকট সম্পূর্ণভাবে দায়ী, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এই কার্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য প্রতি জেলায় একজন করিয়া পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং প্রয়োজনমত দুই একজন অতিরিক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত রাখা হইয়াছে। প্রতি জেলায় যে সকল পুলিসবাহিনী মোতায়েন রাখা হয়, সেগুলির আভ্যন্তরীণ বন্দোবস্তের ভার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই বন্দোবস্ত এবং কর্তৃত্বের জন্য প্রাদেশিক পুলিসের সর্বাধ্যক্ষ ইন্সপেক্টর জেনারেলের এবং তাঁহার বিভাগীয় সহকারীর নিকট জবাবদিহি করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। কিন্তু চোর ডাকাতের অনুসন্ধান এবং শান্তিরক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিবার সময় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তৃত্বাধীনে কার্য করিতে হয়।

মহকুমা শাসন—প্রত্যেক মহকুমার কর্তৃত্বভার একজন কর্মচারীর উপর অর্পিত হইয়াছে। তিনি সাব্‌ডিভিশনাল অফিসার নামে পরিচিত। অভিজ্ঞ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অথবা তরুণ সিভিলিয়নদিগের মধ্য হইতে এই কর্মচারী মনোনীত হইয়া থাকেন। তিনি সর্বতোভাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তৃত্বাধীন। বস্তুত তিনি তাঁহারই সহকারী। মহকুমায় শান্তিরক্ষার জন্য তিনি দায়ী এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবাবদিহি করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ন্যায় তাঁহাকে মহকুমার ফৌজদারী আদালতগুলির পরিদর্শন এবং স্বয়ং ফৌজদারী বিচার করিতে হয়। শান্তিরক্ষার জন্য প্রতি জেলায় যেমন একজন পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন সেইরূপ মহকুমাতেও সাধারণত একজন সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট থাকেন। তাঁহার সাহায্য লইয়াই মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী শান্তিরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ
বিচার বিভাগ

কেবল আইন প্রণয়ন করিলেই গভর্নমেণ্টের কর্তব্য শেষ হয় না। ঐ আইন অনুসারে কার্য হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য একদল কর্মচারী থাকা প্রয়োজন। সেইরূপ আবার বাস্তবিক-পক্ষে কেহ আইন ভঙ্গ করিয়াছে কিনা অথবা কোন ব্যক্তি আইনত তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে কিনা তাহার বিচার করিবার জন্য কতকগুলি গভর্নমেণ্টের বিচারালয় থাকা দরকার। ভারতবর্ষের প্রতি প্রদেশে এইরূপ কতকগুলি নিম্ন এবং উচ্চ, দেওয়ানী এবং ফৌজদারী বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত আছে।

ইউনিয়ন কোর্ট ও বেঞ্চ—কোন কোন গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ড আছে। কতকগুলি বোর্ডকে ছোট ছোট দেওয়ানী এবং ফৌজদারী বিচারের ভার অর্পণ করা হইয়াছে।*

মুন্সেফ কোর্ট—দেওয়ানী বিচারের জন্য প্রতি মহকুমা শহরে এবং কতকগুলি গণ্ডগ্রামে কয়েকটি করিয়া মুন্সেফ কোর্ট আছে। মুন্সেফগণ উচ্চ শিক্ষিত এবং আইন পাশ করা যুবকদিগের মধ্য হইতে মনোনীত হইয়া থাকেন। হাইকোর্টের মনোনয়ন অনুসারে তাঁহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত করা হয়। মুন্সেফ কোর্টে সাধারণত ১০০০৲ টাকা পর্যন্ত যাবতীয় মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়া থাকে। তবে কোন কোন বিশিষ্ট মুন্সেফকে ২০০০৲ টাকা পর্যন্ত মোকদ্দমা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়া থাকে।

---

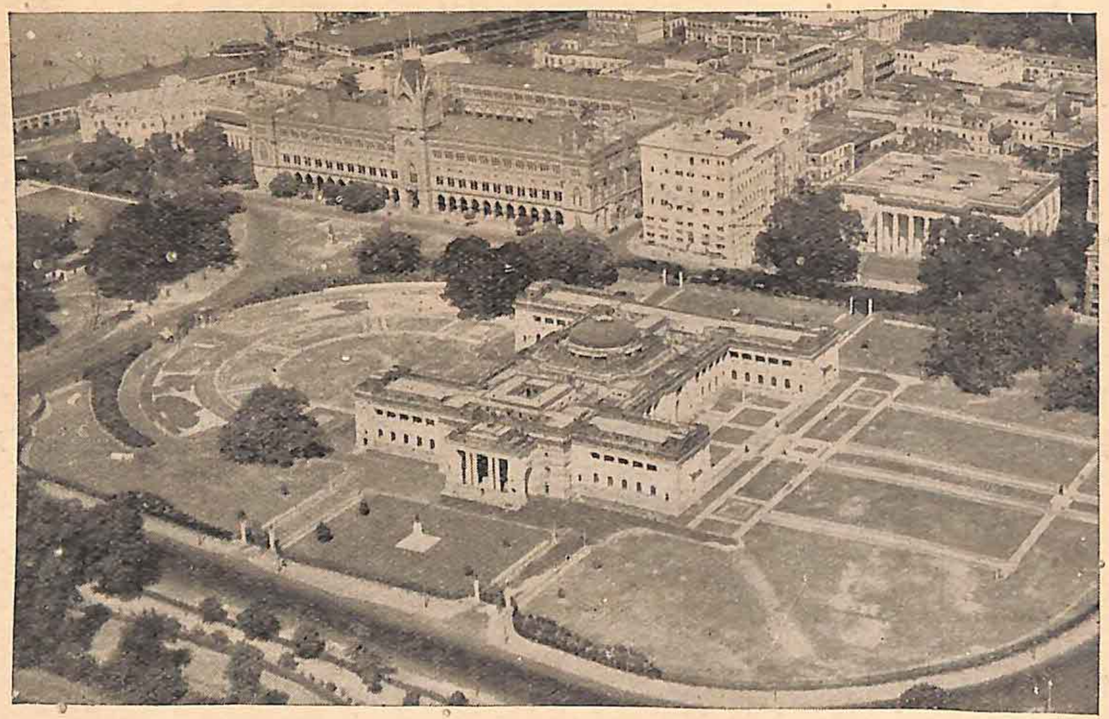
* ১৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জজ কোর্ট—এই মুন্সেফ কোর্টগুলির উপরে প্রতি জেলায় একটি করিয়া জজ কোর্ট স্থাপিত আছে। এই কোর্ট জেলা জজের কর্তৃত্বাধীনে থাকে। সময় সময় প্রয়োজন হইলে দুই একজন অতিরিক্ত জেলা জজও নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত প্রতি জেলাতেই কয়েকজন করিয়া সাব্‌জজ বিচারকার্য করিয়া থাকেন। সাব্‌জজগণ সকলেই এবং জেলা জজদিগের কতকাংশ অভিজ্ঞ মুন্সেফদিগের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। অবশিষ্ট জেলা জজগণ ভারতীয় সিভিলসার্ভিস হইতে এবং দুই চারিজন প্রত্যক্ষভাবে উকিল অথবা ব্যারিস্টারদিগের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। সাব্‌জজগণ কেবলমাত্র দেওয়ানী বিচার করিতে পারেন। জেলা জজ এবং অতিরিক্ত অথবা সহকারী জেলা জজগণের দায়রার কার্যও রহিয়াছে। সে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব। যত টাকা পাওনাই হউক না কেন এবং যত অধিক স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হউক না কেন, জেলা জজ এবং সাব্‌জজগণ সে সকল বিষয়ে বিচার করিবার অধিকারী। এই সকল বিচার করা ভিন্ন জেলা জজের অপর কতকগুলি বিশেষ কর্তব্য আছে। জেলার সমস্ত দেওয়ানী আদালতগুলির পরিদর্শনের ভার তাঁহার উপরে ন্যস্ত। এতদ্ভিন্ন মুন্সেফ এবং সাব্‌জজদিগের কোর্টে ৫০০০৲ টাকা অথবা তাহার কম বিষয় লইয়া যে সমস্ত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয় সেগুলির প্রথম আপীল তাঁহার নিকট হইয়া থাকে।

ফৌজদারী বিচার—চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গা প্রভৃতি বিষয়ের ফৌজদারী বিচার, সাব্‌ডিভিশনাল অফিসার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অথবা অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটদের নিকট হইয়া থাকে। এই ম্যাজিস্ট্রেটদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যাঁহারা প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা পাইয়াছেন সেই সকল ম্যাজিস্ট্রেট দুই বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ

দিতে পারেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটগণ ছয় মাস পর্যন্ত ঐরূপ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটগণ একমাস পর্যন্ত কারাদণ্ড দিবার অধিকারী। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটগণ যে সকল বিচার করিয়া থাকেন সেগুলির আপীল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইয়া থাকে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার জেলার সমস্ত ফৌজদারী আদালতগুলি পরিদর্শন করিতে পারেন। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটগণ যে সকল বিচার করিয়া থাকেন সেগুলির আপীল দায়রা জজের নিকট হইয়া থাকে। আবার ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচার করিতে গিয়া যদি মনে করেন যে আসামীর দুই বৎসরের উপর কারাদণ্ড হওয়া উচিত অথবা তাহার মৃত্যুদণ্ড কিংবা দ্বীপান্তরবাস হওয়া উচিত তাহা হইলে তাঁহারা নিজেরা ঐ বিচার না করিয়া আসামীগণকে দায়রায় সোপর্দ করিবেন। জেলা জজগণই দায়রার কার্য করিয়া থাকেন। সেইজন্য তাঁহাদিগকে জেলা এবং দায়রা জজ (District and Sessions Judge) বলা হয়। দায়রার বিচার করিবার সময় জজদিগকে জুরী লইয়া বসিতে হয়। আসামীগণ দোষী কি নির্দোষ তাহা বলিবার অধিকার জুরীগণের। কিন্তু আসামী দোষী সাব্যস্ত হইলে দায়রা জজই দণ্ড দিবার অধিকারী। জুরীগণ যদি আসামীকে নির্দোষ বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে জজ তাঁহাদের মত মানিয়া লইয়া আসামীকে ছাড়িয়া দিতে পারেন। কিন্তু এ বিষয়ে জুরীগণের সহিত তাঁহার মতানৈক্য হইলে তিনি হাইকোর্টের নিকট বিষয়টি উপস্থিত করিবেন। কোন কোন সময়ে জুরীর পরিবর্তে কয়েকজন এসেসারের (assessor) সাহায্য গ্রহণ করা হয়। এসেসারগণের মত গ্রহণ করা বা না করা জজের ইচ্ছাধীন।

হাইকোর্ট—অধিকাংশ প্রদেশে একটি করিয়া উচ্চ আদালত বা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত আছে। হাইকোর্টগুলিতে একজন করিয়া প্রধান বিচারপতি (Chief Justice) এবং কয়েকজন করিয়া বিচারপতি নিযুক্ত থাকেন। কলিকাতা হাইকোর্টে অতিরিক্ত জজদিগকে লইয়া সর্বসমেত ২০ জন বিচারপতি আছেন। জজ এবং সাব্‌জজদিগের বিচারের আপীল হাইকোর্টে হইয়া থাকে। আপীল শুনিবার সময় দুইজন করিয়া বিচারপতি একসঙ্গে বসিয়া থাকেন এবং উভয়ে একমত হইয়া রায় দিয়া থাকেন। দুইজনের মধ্যে মতানৈক্য হইলে একজন তৃতীয় বিচারপতির নিকট ব্যাপারটি উপস্থিত করা হয় এবং তাঁহার মতানুসারে রায় দেওয়া হয়। কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই এই তিন নগরীর অপেক্ষাকৃত গুরুতর মোকদ্দমাগুলি প্রথমেই হাইকোর্টে দায়ের করা হইয়া থাকে। মফঃস্বল জেলাগুলিতে এই সকল মোকদ্দমা সাব্‌জজ, জেলা জজ এবং দায়রা জজের নিকট প্রথমে হইয়া থাকে। কেবলমাত্র আপীল করিবার সময় সেগুলিকে হাইকোর্টে উপস্থিত করা হয়। কিন্তু এই তিন নগরীতে ঐরূপ জেলা জজ বা সাব্‌জজের ব্যবস্থা নাই। হাইকোর্টই এই কার্য করিয়া থাকেন। হাইকোর্টের বিচারপতিগণ ঐ কোর্টের উকিল, ব্যারিস্টার এবং সিভিলিয়ানদিগের মধ্য হইতে মনোনীত হইয়া থাকেন। সাব্‌জজদিগের মধ্য হইতেও সময় সময় বিচারপতি নিযুক্ত করা যাইতে পারে। বিচারপতিগণ একবার স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলে তাঁহারা ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিচার-কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন। তাহার পর তাঁহাদিগকে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। কোন কোন প্রদেশে হাইকোর্টের পরিবর্তে, জুডিসিয়াল কমিশনারের কোর্ট আছে (সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ)। লক্ষ্ণৌতে একটি চীফ কোর্ট আছে।



এরোপ্লেন হইতে কলিকাতার হাইকোর্ট ও ব্যবস্থাপক সভাগৃহের দৃশ্য

ফেডারেল্ কোর্ট—১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের আইন অনুসারে ভারতবর্ষে একটি ফেডারেল্ কোর্টের (Federal Court) ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কোর্টটি একজন প্রধান বিচারপতি (Chief Justice of India) এবং ছয়জনের অনধিক বিচারপতি লইয়া গঠিত হইবে। এই কোর্টের অধিবেশন সাধারণত ভারতের রাজধানী দিল্লীতে হইবে। প্রধান বিচারপতি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস হইতে মনোনীত হইতে পারিবেন না। তিনি প্রত্যক্ষভাবে অভিজ্ঞ উকিল বা ব্যারিস্টারদিগের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন। যদি তিনি কোন হাইকোর্টের বিচারপতিদিগের মধ্য হইতে মনোনীত হন, তাহা হইলে দেখিতে হইবে এই বিচারপতিগণ আইন-ব্যবসায়ীদিগের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন কি না। এরূপে নিযুক্ত না হইয়া থাকিলে ফেডারেল্ কোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁহাদিগের মধ্য হইতে মনোনীত হইতে পারিবেন না। অন্যান্য বিচারপতিগণ উকিল, ব্যারিস্টার এবং হাইকোর্টগুলির যাবতীয় বিচারপতিদিগের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন। ফেডারেল্ কোর্টের বিচারপতিগণ তাঁহাদের ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত কার্য করিতে পারিবেন। তাহার পর তাঁহাদিগকে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে। রাষ্ট্রতান্ত্রিক ক্ষমতা লইয়া ফেডারেল্ গভর্নমেণ্ট এবং প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের মধ্যে কিংবা ফেডারেল্ গভর্নমেণ্ট এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোন দেশীয় রাজ্যের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার বিচার ফেডারেল্ কোর্টে হইবে। তবে ফেডারেল্ আইনসভা ইচ্ছা করিলে এমন কোন আইন পাশ করিতে পারেন যাহাতে হাইকোর্ট হইতে কোন কোন দেওয়ানী মোকদ্দমার আপীল ফেডারেল্ কোর্টে উপস্থিত করা যায়।

প্রিভি কাউন্সিল—হাইকোর্টগুলি হইতে এবং ফেডারেল্ কোর্ট হইতে আপীল লণ্ডনের প্রিভি কাউন্সিলের নিকট দায়ের করা যাইতে

পারিবে। সাধারণত ইহাকে প্রিভি কাউন্সিলই বলা হয়। কিন্তু ইহার প্রকৃত নাম **'প্রিভি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটি'** (Judicial Committee of the Privy Council)। এই কমিটি বিচারকার্যে অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ আইনজ্ঞদের লইয়া গঠিত। এই কমিটিতে দুইজন বেতনভোগী ভারতীয় আইনজ্ঞ ব্যক্তি নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। ইহাদের বেতন অনেক পরিমাণে ভারতীয় রাজস্ব হইতে দেওয়া হইয়া থাকে। সাধারণত ফৌজদারী মোকদ্দমার কোন আপীল প্রিভি কাউন্সিলের নিকট উপস্থিত করা সম্ভব হয় না। স্বর্গীয় সার্ সৈয়দ আমীর আলি প্রিভি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটির প্রথম ভারতীয় সভ্য ছিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পাব্‌লিক সার্ভিস

মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হইবার পূর্বে শাসনকার্যের দায়িত্ব আমলাদিগের উপরেই সর্বতোভাবে ন্যস্ত ছিল। সেইজন্য এদেশের শাসনতন্ত্র আমলাতন্ত্র (Bureaucracy) বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ১৯১৯ এবং ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শাসনসংস্কার বিষয়ে যে আইন দুইটি পাশ হয় তাহাতে আমলাদিগের গভর্নমেণ্ট পরিচালনার দায়িত্ব বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে। তাহা হইলেও তাহাদের হস্তে এখনও প্রভূত ক্ষমতা রহিয়াছে।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস্—ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পূর্বে গভর্নমেণ্টের নামান্তরমাত্র ছিল। সিভিলিয়নগণই সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া শাসনপ্রণালী নিরূপণ করিতেন এবং শাসনতন্ত্র পরিচালিত করিতেন। আইনসভা, মন্ত্রিসভা প্রভৃতির প্রবর্তন হইলেও প্রকৃতপক্ষে শাসনক্ষমতা অধিকাংশক্ষেত্রে এখনও তাঁহাদের হস্তেই থাকিবে। তাঁহাদিগের মধ্য হইতেই অধিকাংশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা জজ, বিভাগীয় কমিশনার, মন্ত্রীদিগের দপ্তরখানার সেক্রেটারী ও অন্যান্য উচ্চ কর্মচারী এবং অধিকাংশ প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হইবেন। সিভিলিয়নগণকে পূর্বের ন্যায় এখনও ভারতসচিব নিযুক্ত করিবেন এবং ভারতসচিব ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন না। প্রাদেশিক অথবা ফেডারেল্ গভর্নমেণ্টের কোন আচরণে বেতন, পেনসন, পদোন্নতি প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহাদের অধিকার কোনভাবে

খর্ব হইলে ভারতসচিবের নিকট তাঁহারা আপীল করিতে পারিবেন। সিভিলিয়নদিগের মনোনয়ন বিষয়ে লী কমিশনের (Lee Commission) সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে যে নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে তদনুসারে প্রতি বৎসর যে কয়জন সিভিলিয়ন নিযুক্ত করা হয়, তাঁহাদের অর্ধাংশ ভারতীয়দিগের মধ্য হইতে লওয়া হয়। সিভিলিয়ন পদপ্রার্থী সকলকেই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিতে হয় এবং সাধারণত ঐ পরীক্ষার ফল অনুসারে তাঁহারা মনোনীত হইয়া থাকেন। পরীক্ষা ভারতবর্ষে এবং ইংলণ্ডে হইয়া থাকে। সম্প্রতি ইংলণ্ডে সিভিলিয়ন পদপ্রার্থীদের মধ্যে কয়েকজনকে পরীক্ষা ব্যতীতই মনোনয়ন করার রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে।

প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস্‌—ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ভিন্ন প্রতি প্রদেশে আরও দুইটি করিয়া সিভিল সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত আছে। বাংলাদেশে ইহার প্রথমটিকে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস এবং দ্বিতীয়টিকে বেঙ্গল জুনিয়ার সিভিল সার্ভিস বলা হয়। যাঁহারা প্রথমটিতে নিযুক্ত হন তাঁহারা সাধারণত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি কলেক্টর, কো-অপারেটিভ বিভাগের সরকারী রেজিস্ট্রার, গভর্নমেণ্টের দপ্তরখানার সহকারী সেক্রেটারী প্রভৃতি কর্মচারীদের কার্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। অনেকদিন এরূপ কার্যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিলে এবং দক্ষতা দেখাইলে তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চ কর্মচারীর পদে উন্নীত করা হয়। দ্বিতীয় সার্ভিসটিতে যাঁহারা নিযুক্ত হইয়া থাকেন তাঁহাদের সার্কল্‌ অফিসার, সাব্‌-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি কর্মচারীদিগের কার্য করিতে হয়। অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা অনুসারে তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনকে প্রথম সার্ভিসে উন্নীত করা হয়। প্রত্যক্ষভাবে যাঁহারা এই দুই সার্ভিসে নিযুক্ত হইবার প্রার্থী তাঁহাদিগকে প্রতিযোগিতামূলক

পরীক্ষা দিতে হয়। তবে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান এবং অনুন্নত জাতিগুলির জন্য প্রতিযোগিতা পৃথক্‌ভাবে করা হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর যে কয়জন প্রার্থী নিযুক্ত হন তাঁহাদের শতকরা ৫০ জন মুসলমান।

এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত আছে। ভারতবর্ষীয় মেডিক্যাল সার্ভিস তাহাদের অন্যতম। এই সার্ভিসের ডাক্তারগণ সমর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারা সামরিক কর্মচারীদের ন্যায় লেফ্‌টেন্যাণ্ট, ক্যাপ্টেন, মেজর ইত্যাদি পদবী দ্বারা পরিচিত। বস্তুত তাঁহাদের অনেকে সমরবিভাগেই কাজ করিয়া থাকেন এবং সৈন্যদিগের চিকিৎসার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। প্রয়োজনমত প্রতি প্রদেশে জেলাগুলির সিভিল সার্জন এবং কেন্দ্রীয় জেলাগুলির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসাবে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা হয়। এই কর্মচারিগণকে ভারতসচিব নিযুক্ত করিয়া থাকেন। যদিও প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের কর্মচারীরূপে তাঁহারা কার্য করিয়া থাকেন, তথাপি ঐ গভর্নমেণ্টগুলি তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন না। ঐ অধিকার একমাত্র ভারতসচিবেরই আছে।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের নূতন ভারত গভর্নমেণ্ট আইন অনুসারে ফেডারেল্‌ ও প্রাদেশিক পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশন (Federal and Provincial Public Service Commissions) প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কমিশনগুলির সভাপতি ও অন্যান্য সভ্যগণ যথাক্রমে গভর্নর-জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্নরগণ কর্তৃক তাঁহাদের ইচ্ছামত (in their discretion) নিযুক্ত হইবেন। সভাপতি ও সভ্যগণের বেতন গভর্নর-জেনারেল ও গভর্নরগণ ধার্য করিবেন। ঐ বেতন ও পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশনের অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের মতামতের উপর নির্ভর করিবে না। ফেডারেল্‌ এবং প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশনগুলি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের (Federal India) এবং

প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট সম্বন্ধীয় সকল প্রকার চাকুরীর জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং চাকুরী প্রার্থিগণের যোগ্যতা নির্ণয় করিতে পারিবে। আশা করা যায় যে, এই সকল কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতবর্ষের ফেডারেল্‌ ও প্রাদেশিক পাব্‌লিক সার্ভিসগুলির কর্মচারী নির্বাচনে সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা প্রবর্তিত হইবে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের অর্থনৈতিক সম্পর্ক

প্রাদেশিক তহবিলের প্রবর্তন—১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলির নিজস্ব কোন আয় ছিল না। গভর্নমেণ্টের আয় বলিতে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের আয়ই বুঝাইত। প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলি শাসনকার্য চালাইবার জন্য যে অর্থ ব্যয় করিতেন তাহা সমস্তই কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে যথাক্রমে আসিত। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মেয়োর শাসনকালে এই ব্যবস্থার প্রথম পরিবর্তন আরম্ভ হইল। এখন হইতে প্রতি বৎসর কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টকে কিছু পরিমাণ টাকা একযোগে প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি শাসনবিভাগ পরিচালনার দায়িত্বও ঐ গভর্নমেণ্টকে দেওয়া হইল। প্রদত্ত টাকা হইতে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলি এই বিভাগসমূহ পরিচালনা করিতে বাধ্য হইলেন। এই ব্যবস্থা চিরস্থায়ীভাবে হইল না। কিছুদিন পর পর ইহার পরিবর্তন হইবে স্থির হইল। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লিটনের শাসনকালে দ্বিতীয়বার যখন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলির মধ্যে এই বিষয়ে বন্দোবস্ত হয়, তখন পূর্বের ন্যায় প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টকে নির্দিষ্ট টাকা প্রদান করিবার প্রথা বজায় রাখা হইল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাদকদ্রব্য, আয়-কর ও স্ট্যাম্প ডিউটি প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের

হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সুতরাং এই গভর্নমেণ্টের আয় অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। তবে আয়ের সহিত ব্যয়ের মাত্রাও বাড়িল। নূতন কয়েকটি বিভাগ পরিচালনার ভার ইহার উপর দেওয়া হইল। দুইটি প্রদেশের গভর্নমেণ্টকে নির্দিষ্ট টাকা প্রদান না করিয়া ভূমিকর হইতে যে আয় হইত তাহার কিয়দংশ দেওয়া হইয়াছিল। নির্দিষ্ট টাকা দেওয়ার পরিবর্তে কোন বিভাগীয় আয়ের নির্দিষ্ট অংশ প্রদান করিবার রীতি এইভাবে প্রথম প্রবর্তিত হইয়া পরে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই নিয়ম সকল প্রদেশেই সমভাবে প্রচলিত করা হয়। সুতরাং এখন হইতে ভারতবর্ষে আয়ের তিনপ্রকার বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম বিভাগগুলির আয় ভারত গভর্নমেণ্টের প্রাপ্য, দ্বিতীয় গুলির আয় প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের প্রাপ্য এবং তৃতীয়গুলির আয় ভারত ও প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের মধ্যে বিভক্ত হইত (divided heads)। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত সম্পূর্ণভাবে অস্থায়ী ছিল। পাঁচ বৎসর অন্তর ইহার পরিবর্তন হইতে পারিত। কিন্তু এই বৎসর বন্দোবস্ত মোটামুটিভাবে পাকা ও স্থায়ী করা হইল। যে সকল বিভাগের আয় প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের হস্তে প্রদান করা হইল, কোন বিশেষ অসুবিধা না হইলে তাহার কোন পরিবর্তন করা হইবে না বলিয়া স্থির হইল।

মেস্টন বন্দোবস্ত—১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড আইন পাশ হয় এবং নূতন শাসননীতি প্রবর্তিত হইবার উপক্রম হয়। এই আইন অনুসারে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলি অনেক পরিমাণে নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে পারিবে বলিয়া স্থির হইল। ইহাদের কাজকর্ম ও দায়িত্ব কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট হইতে অনেক পরিমাণে পৃথক্ করিয়া দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আয়ের ব্যবস্থাও পৃথক্ করিয়া দেওয়ার

বন্দোবস্ত হইল। ভারত গভর্নমেণ্টের ভূতপূর্ব অর্থসচিব লর্ড মেস্টনের অধিনায়কত্বে একটি কমিটি বসান হইল। এই কমিটি সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে এক বিবৃতি পেশ করে। এই বিবৃতি অনুসারেই নূতন অর্থ নৈতিক বন্দোবস্ত করা হয়। ফলে বহির্বাণিজ্যের উপর শুল্ক, আয়-কর, লবণ-কর, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগ, রেলওয়ে এবং অফিম বিক্রয় হইতে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের যাবতীয় আয় সাধারণত আসিয়া থাকে। অপরপক্ষে ভূমি-কর, মাদকীয় দ্রব্যের উপর শুল্ক, জঙ্গল বিভাগ, জলসেচন বিভাগ এবং আমোদ-প্রমোদের উপর কর প্রভৃতি হইতে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলির আয় হইয়া থাকে। কোন কোন অবস্থায় আয়-কর হইতে উৎপন্ন আয়ের কিয়দংশ প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলি পাইতে পারিতেন, কিন্তু ঐরূপ অবস্থার উদয় না হওয়ায় আয়-কর হইতে উৎপন্ন যাবতীয় আয় মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন আমলের পনের বৎসর ভারত গভর্নমেণ্টই উপভোগ করিয়াছেন। এই আমলের প্রথম দিকে এক নির্দিষ্ট হারে অধিকাংশ প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টকে অর্থসাহায্য করিতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে এই নিয়ম বাতিল করিয়া দেওয়া হয়।

বর্তমান বন্দোবস্ত—মেস্টন বন্দোবস্তের ফলে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলির উপর, বিশেষ করিয়া বাংলার উপর, অবিচার করা হইয়াছিল। একদিকে তাঁহাদের কর্তব্যভার ছিল অতীব গুরু, অপরদিকে আয়ের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত লঘু। প্রদেশে শান্তিরক্ষা, জেল, আদালত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, জলসেচন করিবার ব্যবস্থা, কৃষি ও শিল্পের উন্নতিসাধন, শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং রোগমুক্তির ব্যবস্থা—এই যাবতীয় দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু এই কর্তব্য সুচারুরূপে পালনের জন্য যে অর্থের

প্রয়োজন তাহা অধিকাংশ প্রদেশগুলির ছিল না। সুতরাং নূতন শাসন-তন্ত্রের প্রবর্তন করিবার সময় এই অর্থনৈতিক বন্দোবস্তেরও পরিবর্তন বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সাইমন কমিশন এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া বিবৃতি প্রদান করিবার জন্য ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ *Economist* কাগজের সম্পাদক লেটন সাহেবের (Mr. W. T. Layton) সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন। পরে লর্ড পার্সির (Lord Percy) অধিনায়কত্বে এক কমিটি এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া বিবৃতি প্রদান করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। এই সকল বিবৃতির উপর নির্ভর করিয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের মধ্যে এক নূতন অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের কর্তব্যভার—যে-সমস্ত বিভাগ পরিচালনা করিবার দায়িত্ব এবং ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে, নিম্নলিখিতগুলি তাহাদের অন্যতম—

১। সমর বিভাগ।

২। পররাষ্ট্র বিভাগ।

৩। যুক্তরাষ্ট্রের ঋণপরিশোধের ব্যবস্থা।

৪। পোস্ট এবং টেলিগ্রাফ বিভাগ।

৫। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, ভারতীয় যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ।

৬। আদম-সুমারির ব্যবস্থা।

৭। ফেডারেল্ রেলওয়ে নির্মাণ এবং পরিচালনা।

যে সকল বিভাগ প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং যেগুলির ব্যয়ভার প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টকে বহন করিতে হইবে, মোটামুটিভাবে নিম্নে তাহাদের তালিকা দেওয়া হইল—

১। শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশের ব্যবস্থা।

২। আদালতগুলির সংরক্ষণ।

৩। জেলবিভাগ পরিচালনা।

৪। প্রাদেশিক ঋণশোধের ব্যবস্থা।

৫। সাধারণ স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং রোগমুক্তির জন্য ডাক্তারখানা প্রভৃতির পরিচালনা।

৬। শিক্ষা বিস্তার।

৭। জলসেচন ও কৃষির উন্নতি সাধন।

৮। শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা।

৯। মন্ত্রী এবং অন্যান্য প্রাদেশিক কর্মচারীদিগের বেতন প্রদান।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের আয়ের ব্যবস্থা— ফেডারেল্ গভর্নমেণ্টের বিভাগগুলি পরিচালনার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহা নিম্নলিখিত উপায়ে সংগ্রহ করা হইবে—

১। বহির্বাণিজ্যের উপর শুল্ক স্থাপন।

২। কর্পোরেশনের উপর কর স্থাপন।

৩। লবণের উপর কর স্থাপন।

৪। আয়ের উপর কর স্থাপন (কিন্তু কৃষিজ আয়ের উপর ফেডারেল্ গভর্নমেণ্ট কর স্থাপন করিতে পারিবেন না)।

৫। উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তিলাভের উপর কর স্থাপন (কিন্তু এইভাবে কৃষি জমি লাভ করিলে তাহার উপর ফেডারেল্ গভর্নমেণ্ট কর বসাইতে পারিবেন না)।

৬। রেলওয়ে হইতে আয়।

৭। পোস্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগ হইতে আয়।

প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলি তাঁহাদের যাবতীয় বিভাগ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নিম্নলিখিত উপায়ে সংগ্রহ করিবেন—

১। ভূমির উপর কর স্থাপন।

২। মাদক দ্রব্যের উপর কর স্থাপন।

৩। কৃষিজ আয়ের উপর কর স্থাপন।

৪। উত্তরাধিকারসূত্রে কৃষি জমি লাভের উপর কর স্থাপন।

৫। আমোদ প্রমোদ, জুয়াখেলা প্রভৃতির উপর কর স্থাপন।

উপরিউক্ত উপায়ে যে অর্থসংগ্রহ হইবে তাহাতে বাংলা গভর্নমেণ্টের খরচ সঙ্কুলান হইবে না। সেইজন্য স্থির হইয়াছে যে, বিদেশের পাট রপ্তানির উপর শুল্ক বসাইয়া যে আয় হইয়া থাকে তাহার অর্ধাংশ বাংলা গভর্নমেণ্টকে দেওয়া হইবে।

ভারতবর্ষের সাধারণ ঋণ (Public Debt)—ভারতবর্ষের সমুদয় সাধারণ ঋণ ১২০০ কোটি টাকার উপরে। ইহার মধ্যে ভারত গভর্নমেণ্টের ঋণ প্রায় ১১৫০ কোটি টাকা। অবশ্য এই টাকার কিয়দংশ ভারত গভর্নমেণ্ট প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলিকে ধার দিয়াছেন। প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলি আবার নিজেদের দায়িত্বে প্রায় ১৬॥ কোটি টাকা ধার করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সাধারণ ঋণের শতকরা ৫৭ ভাগ ভারতবর্ষে করা হইয়াছে; অবশিষ্টাংশ ইংলণ্ডে তোলা হইয়াছে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাধারণ ঋণের পরিমাণ ভারতবর্ষে অল্পই ছিল। ঐ বৎসর এই ঋণ ৫১০ কোটি টাকা মাত্র ছিল। কিন্তু তৎপরে বৎসরের পর বৎসর এই ঋণ বাড়িয়া ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ১২২৩ কোটিতে দাঁড়াইল। তবে সুখের বিষয় এই যে, এই বিরাট ঋণের অধিকাংশই রেলওয়ে নির্মাণ, পোস্ট এবং টেলিগ্রাফ বিভাগের উন্নতিসাধন, এবং জলসেচনের ব্যবস্থা প্রভৃতি দেশের হিতকর কার্যে ব্যয় হইয়াছে। এই ব্যয়ের ফলে এই

বিভাগগুলি অনেক পরিমাণে প্রসার লাভ করিয়াছে এবং তাহাতে দেশের প্রভূত উন্নতিসাধন হইয়াছে। এই বিভাগগুলির আয় হইতেই ঋণ-শোধের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। বস্তুত ভারত গভর্নমেণ্ট যে ঋণ করিয়াছেন তাহার শতকরা ৯৩ টাকা এইভাবে শোধ করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কেবলমাত্র ৮১ কোটি টাকা পরিমাণ ঋণের পরিশোধের জন্য এরূপ কোনও ব্যবস্থা নাই। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, যদিও ঋণের পরিমাণ অত্যল্প নহে, তথাপি তাহাতে ভারত গভর্নমেণ্টের আর্থিক অবস্থা কোনক্রমেই শোচনীয় হয় নাই।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

দেশীয় রাজ্যসমূহ (The Indian States)

দেশীয় রাজ্যগুলির সংখ্যা—ভারতবর্ষ দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগ ব্রিটিশ ভারত নামে পরিচিত, দ্বিতীয়ভাগ দেশীয় নৃপতিগণের শাসনাধীন। দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতবর্ষের দুই-পঞ্চমাংশ জমি এবং প্রায় এক-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা লইয়া গঠিত। রাজ্যগুলির সংখ্যা বর্তমানে ৫৬২। এইগুলিকে সাধারণত তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। যে ১০৮টি রাজ্য নিজেদের অধিকার অনুসারে নৃপতি সম্মেলনের সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে তাহাদের লইয়াই প্রথম শ্রেণী গঠিত। দ্বিতীয় বিভাগে ১২৭টি রাজ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলির জমি, লোকসংখ্যা, এবং আর্থিক আয় প্রথম শ্রেণীর রাজ্যগুলি হইতে অনেক পরিমাণে কম। তাঁহারা নিজেদের অধিকারের উপর দাঁড়াইয়া নৃপতি সম্মেলনের সভ্য হইতে পারেন না। তাঁহারা সকলে মিলিয়া ১২ জন সভ্য মনোনীত করিতে পারেন মাত্র। তৃতীয় বিভাগের অন্তর্গত রাজ্যগুলির সংখ্যা ৩২৭। কিন্তু এগুলিকে রাজ্য না বলিয়া জায়গীর বা জমিদারী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই জায়গীরগুলির অধিকারীদিগের অনেকের আয় এত কম যে সাধারণ তন্তুবায় বা মিস্ত্রিও উহার অধিক রোজগার করিয়া থাকে।

ভারত সরকারের সহিত সম্পর্ক—রাজ্যগুলির সহিত বৃটিশ সরকারের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নানাভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। যেভাবেই উহা গড়িয়া উঠুক না কেন, ঐ সম্পর্ক অনুসারে ইংলণ্ডের রাজা নৃপতিগণের সম্রাট এবং রাজচক্রবর্তী। অনেক ব্যাপারে রাজ্যগুলির উপর প্রভুত্ব করিবার অধিকার তাঁহার আছে। ইংলণ্ডেশ্বরের এই অধিকার এতদিন পর্যন্ত ভারতসচিব এবং সপরিষদ গভর্নর-জেনারেল উপভোগ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু নৃপতিগণ এই বন্দোবস্তে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর সার্ হারকোর্ট বাট্লারের অধিনায়কত্বে একটি কমিটি এই সকল বিষয় তদন্ত করিবার জন্য গঠিত হয়। এই কমিটির নিকট নৃপতিগণ প্রস্তাব করেন যে, তাঁহাদের উপর প্রভুত্ব করিবার অধিকার ভারত-সরকারের উপর ন্যস্ত না থাকিয়া একমাত্র সম্রাটের প্রতিনিধির উপরই উহা ন্যস্ত হওয়া উচিত। এই প্রস্তাব কমিটি অনুমোদন করেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে যে নূতন শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে রাজ্যগুলির উপর কর্তৃত্ব করিবার ভার ভারত-সরকারের হাত হইতে সরাইয়া সম্রাটের প্রতিনিধির (His Majesty's Representative as regards relations with Indian States) হাতে দেওয়া হইয়াছে।*

প্যারামাউন্ট অধিকার—ইংলণ্ডেশ্বর দেশীয় রাজ্যগুলির উপর যে সকল অধিকার উপভোগ করিয়া থাকেন, সেগুলিকে সাধারণত "প্যারামাউন্ট" (paramount) অধিকার বলা হইয়া থাকে। এইগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) পররাষ্ট্রীয়, (২) আভ্যন্তরীণ। দেশীয় রাজ্যগুলি পররাষ্ট্র ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্রিটিশ সরকারের অধীন। নিজেদের

* ৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ইচ্ছা বা স্বার্থ অনুসারে তাঁহারা কোন বহিঃরাজ্যের সহিত সন্ধি বা বিগ্রহ করিতে পারেন না, এমন কি কোন যোগাযোগও রাখিতে পারেন না। বস্তুত পররাষ্ট্র ব্যাপারে দেশীয় রাজ্যগুলির অধিকার ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলির অধিকার অপেক্ষা বেশি নহে। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের অধিকারগুলি বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ধরণের। যে সমস্ত রাজ্য জায়গীরবিশেষ, সেগুলিতে আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য অনেক পরিমাণে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিদিগের হস্তে ন্যস্ত। কিন্তু প্রধান রাজ্যগুলিতে এই আভ্যন্তরীণ অধিকার নাই বলিলেই হয়। তবে কোন রাজ্যে অরাজকতা আরম্ভ হইলে অথবা প্রজাদের উপর অনবরত ঘোর অত্যাচার চলিতে থাকিলে ব্রিটিশ সরকার ঐদিকে নজর দিতে পারেন। ইচ্ছা করিলে অত্যাচারী অথবা অপদার্থ নৃপতিকে মসনদ হইতে অপসৃত করিয়া অপর কাহাকে ঐ আসনে বসাইতে পারেন। নৃপতি নাবালক হইলেও ব্রিটিশ সরকার রাজ্য-শাসনের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

রাজ্যগুলির শাসন ব্যবস্থা—দেশীয় রাজ্যগুলির শাসনভার সাধারণত নৃপতিগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে। তাঁহারা নিজেদের অভিলাষ অনুসারে শাসনকার্য চালাইয়া থাকেন। প্রজাদিগের এই ব্যাপারে কোন অধিকার নাই। গণতন্ত্রবাদ এখনও এই রাজ্যগুলিতে ব্যাপক-ভাবে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তবে ৩০টি রাজ্যে ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং কয়েকটি রাজ্যে ঐ সভাগুলির সদস্যগণ বহুল পরিমাণে প্রজাদিগের মনোনীত। ঐ কয়েকটি রাজ্যে ব্যবস্থাপক সভাগুলির অধিকারও একেবারে নগণ্য নহে। আশা করা যায়, ধীরে ধীরে অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইহার উপর প্রকৃত দায়িত্বভার অর্পণ করা হইবে। বর্তমানে



দিল্লীর চেম্বার অব্ প্রিন্সেসের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য

মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও বরোদা এই বিষয়ে অগ্রণী। সম্প্রতি কাশ্মীর রাজ্যেও ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিচারকার্যের সুব্যবস্থা ৪০টি রাজ্যে হইয়াছে। এই রাজ্যগুলিতে ব্রিটিশ ভারতের দৃষ্টান্ত অনুসারে উচ্চ আদালত (High Court) স্থাপন করা হইয়াছে।

নরেন্দ্রমণ্ডল—বহুদিন পর্যন্ত নৃপতিগণ একত্র সম্মিলিত হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁহারা ব্রিটিশ সরকারের বিনা



বিকানীরের মহারাজা

অনুমতিতে পরস্পরের সহিত কোনপ্রকার সম্পর্ক রাখিতে পারিতেন না। কিন্তু ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালে কয়েকজন নৃপতিকে একত্র করিয়া গভর্নর-জেনারেল শাসন ব্যাপারের পরামর্শ করেন। ইহার পর এইরূপ সম্মেলন প্রায়শ হইতে থাকে। ১৯১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু গভর্নর জেনারেল লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের

সহিত একযোগে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসন পদ্ধতির আলোচনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা দেশীয় রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও আলোচনা করেন এবং তাঁহাদের বিবৃতিতে এই বিষয়ে এক প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাব অনুসারেই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে নরেন্দ্রমণ্ডল (Chamber of Princes) গঠিত হয়। এই সময় হইতে স্থায়ীভাবে এবং আইন অনুসারে নৃপতিগণ মিলিত হইয়া রাজ্যগুলির সহিত ব্রিটিশ



ভূতপূর্ব পাতিয়ালার মহারাজা

ভারতের এবং রাজন্যবর্গের সহিত ব্রিটিশ সরকারের সম্পর্ক বিষয়ে নানা আলোচনা আরম্ভ করেন। নরেন্দ্রমণ্ডলের সভ্যসংখ্যা ১২০। তন্মধ্যে ১০৮ জন নিজেদের ব্যক্তিগত অধিকার অনুসারে সভ্যপদ পাইয়াছেন, অপর ১২ জন ১২৭টি মধ্যম শ্রেণীর রাজ্যগুলির প্রতিনিধি হিসাবে সভ্যপদ লাভ করিয়াছেন। মণ্ডলের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য ইহার একজন চ্যান্সেলার ও একটি স্ট্যান্ডিং কমিটির বন্দোবস্ত করা

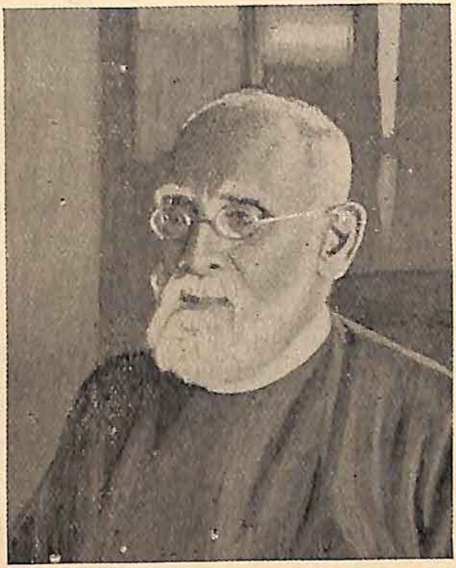
হইয়াছে। বিকানীরের মহারাজা মণ্ডলের প্রথম চ্যান্সেলার নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরে পাতিয়ালার মহারাজা অনেকদিন এই পদে আসীন ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে পাতিয়ালার মহারাজা পুনরায় নরেন্দ্রমণ্ডলের চ্যান্সেলার নির্বাচিত হইয়াছিলেন; সম্প্রতি তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (Local Self-Government)

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। প্রাথমিক শিক্ষা না হইলে যেমন উচ্চ বিজ্ঞান বা সাহিত্যের চর্চা করা সম্ভব হয় না, সেইরূপ গ্রামে এবং নগরীতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া না উঠিলে, শাসনকার্য গণতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নহে। ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে প্রতি গ্রামে মোটামুটিভাবে পঞ্চায়েতী-প্রথা প্রচলিত ছিল। গ্রাম-বৃদ্ধেরা মিলিয়া সালিসী বিচার হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য এবং ইহার উন্নতির পথ সুগম করিবার জন্য সাধারণের নানাপ্রকার কার্যে তৎপর থাকিতেন। গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন এইরূপে অপেক্ষাকৃত দৃঢ়ভাবে এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু গ্রামের বাহিরে স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতির কোন বিকাশ হয় নাই। মধ্যযুগে মুসলমান আমলে পরগণা এবং সরকারগুলির কোনটিকে আশ্রয় করিয়াই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন গড়িয়া তোলা হয় নাই। নগরীগুলিতেও ঐ নীতি অবলম্বন না করিয়া শাসনকার্যের ভার কোতোয়ালের হস্তেই ছাড়িয়া দেওয়া হইত। গ্রামগুলিতে যে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল বাংলাদেশে তাহাও ক্রমে মৃতপ্রায় হইয়া গত শতাব্দীর প্রথমভাগে অপসৃত হইয়াছিল। সুতরাং বর্তমানে আমরা যে-সকল স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাই, সেগুলির সমস্তই গত এক শতাব্দীর মধ্যে গঠন করা হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি টাউনগুলিতে মিউনিসিপ্যালিটি প্রবর্তন— সর্বপ্রথমে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই এই তিনটি প্রধান নগরীতে মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃত্ব অনেক পরিমাণে করদাতাদিগের মনোনীত সভ্যদিগের



সার্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এই স্বায়ত্তশাসন ২৫ বৎসর কাল বহাল থাকিবার পূর্বেই কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের পরিবর্তন করা হয় (১৮৯৯ খ্রীঃ)। এই সময় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি জন-নায়কগণ এই পরিবর্তনের তীব্র প্রতিবাদ করেন। কিন্তু প্রতিবাদে কোন ফল হয় নাই। আইন পরিবর্তিত হইল এবং ইহার পর প্রায়

পঁচিশ বৎসর কাল নূতন নিয়মানুসারে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

কার্য চলিতে থাকিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হয়। এই আমলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সরকারের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। মন্ত্রী হিসাবে তাঁহার সর্বপ্রধান কার্য হইল কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে সর্বতোভাবে স্বায়ত্তশাসন ও গণতান্ত্রিক নীতি প্রবর্তিত করা। তাঁহার নেতৃত্বে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে নূতন কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন পাশ হইল এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম হইতে নূতন আইন অনুসারে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির শাসনকার্য চলিতে লাগিল। এখন হইতে মিউনিসিপ্যাল কার্য পরিচালনার সম্যক্ দায়িত্ব এক কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করা হইল। এই কাউন্সিলই মিউনিসিপ্যালিটির মেয়র এবং একজিকিউটিভ্ অফিসারদিগকে নির্বাচিত এবং নিযুক্ত করিয়া থাকে। মেয়র এক বৎসরের জন্য কাউন্সিলের সভ্যদিগের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। কাউন্সিলের অধিবেশনগুলির তিনিই প্রেসিডেন্ট। কলিকাতার প্রথম মেয়র ছিলেন স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

মফঃস্বল শহরে মিউনিসিপ্যালিটি প্রবর্তন ; লর্ড রিপনের প্রচেষ্টা—কেবলমাত্র তিনটি প্রেসিডেন্সি টাউনেই (কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই) যে মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা নহে। ক্রমে মফঃস্বল টাউনগুলিতেও মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ৩০ বৎসরে প্রতি জেলার প্রধান শহরে এবং অন্যান্য অনেকগুলি শহরেও মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। তবে মিউনিসিপ্যাল বোর্ডগুলি সমস্তই মনোনীত সভ্য এবং গভর্নমেণ্টের কর্মচারীদিগকে লইয়া গঠিত হইত। কিন্তু এই অবস্থা আর বেশিদিন স্থায়ী রহিল না। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতিকল্পে এক প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। এই সময় লর্ড রিপন ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল ছিলেন। তাঁহারই নেতৃত্বাধীনে এবং

ইচ্ছা অনুসারে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি এতদিন ভিতর এবং বাহির উভয় দিক্ হইতেই গভর্নমেণ্টের করতলগত ছিল। একদিকে প্রতিষ্ঠানগুলির সভ্যগণ গভর্নমেণ্টের মনোনীত ছিলেন এবং তাঁহাদের সভাপতি এবং কর্মকর্তা ছিলেন গভর্নমেণ্টের কর্মচারী। অপর দিকে গভর্নমেণ্টের বিনা অনুমতিতে ইঁহাদের বিশেষ কিছুই করিবার অধিকার ছিল না। ভারত গভর্নমেণ্ট এখন প্রস্তাব করিলেন যে প্রতিষ্ঠানগুলির সভ্যগণ করদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইতে পারিবেন, তাহাদের সভাপতিগণ সভ্যদিগের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন এবং তাহাদের সাধারণ কার্যকলাপে গভর্নমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না। ভারত সরকারের এই প্রস্তাব প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলির নিকট প্রেরিত হয় এবং ইহার উপর ঐ গভর্নমেণ্টগুলি নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। এইরূপ বহু তর্কবিতর্কের পর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদ এক মিউনিসিপ্যাল বিল পাশ করেন এবং এইরূপে পাশ হইয়া ঐ বিলটি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টে পরিণত হয়। এই অ্যাক্ট অনুসারে বাংলাদেশের মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। প্রথম শ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটিগুলির দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য করদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন এবং তাহাদের সভাপতিগণও সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটিগুলির সভ্যদিগের দুই-



লর্ড রিপন

তৃতীয়াংশ করদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন বটে কিন্তু তাহাদের সভাপতিগণ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হইতেন। তৃতীয় শ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটিগুলির সভ্যগণ সকলেই গভর্নমেণ্টের মনোনীত ছিলেন। গভর্নমেণ্ট ইচ্ছা করিলে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে নিম্নশ্রেণী হইতে উচ্চশ্রেণীতে তুলিয়া দিতে পারিতেন।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধক আইন—১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে। এই পরিবর্তনের ফলে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির সভ্যদিগের তিন-চতুর্থাংশ করদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং এক-চতুর্থাংশকে গভর্নমেণ্ট মনোনীত করেন। নির্বাচিত সভ্যদিগের মধ্যে কয়েকজনের আসন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট রাখা হয়। যে সকল শহরে হিন্দুগণ সংখ্যায় অল্প, সেগুলিতে হিন্দুদিগের জন্য কয়েকটি আসন নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, আবার যেগুলিতে মুসলমানগণ সংখ্যায় অল্প সে সব মিউনিসিপ্যালিটিতে তাহাদের জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতিগণ সভ্যদিগের দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন। মিউনিসিপ্যালিটির কার্য পরিচালনার জন্য প্রতি মাসেই সভ্যদিগের অধিবেশন হইয়া থাকে এবং তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত অনুসারে সভাপতি মহাশয় বেতনভোগী কর্মচারীদিগের সাহায্যে দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিভাগীয় কমিশনার মিউনিসিপ্যালিটিগুলি পরিদর্শন করিতে পারেন এবং কমিশনার ইচ্ছা করিলে সভ্যদিগের সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রে বাতিল করিয়া দিতে পারেন। বেতনভোগী কর্মচারী নিয়োগ ব্যাপারেও বিভাগীয় কমিশনার এবং প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট অনেক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন।

মিউনিসিপ্যালিটির কার্য এবং আয়-ব্যয়—মিউনিসিপ্যালিটিগুলির কার্যতালিকার মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, জল সরবরাহ, আবর্জনা পরিষ্কার, আলোর বন্দোবস্ত, স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা, রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহা সাধারণত শহরবাসীদিগের উপর কর বসাইয়া, গভর্নমেণ্টের সাহায্য লইয়া, এবং কখনও কখনও ঋণ করিয়া সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। অবশ্য কিছু অর্থ যানবাহন এবং খোঁয়াড় হইতেও পাওয়া যাইয়া থাকে। বাংলার বাহিরে অন্যান্য কতকগুলি প্রদেশে অকট্রয় কর (Octroi tax) বসাইয়া মিউনিসিপ্যালিটির অর্থ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে, কিন্তু বাংলাদেশে এই কর বসান হয় না। মিউনিসিপ্যালিটিগুলির বার্ষিক আয় ৫০০০৲ হইতে ২,১০০,০০০৲ টাকা পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

জেলা কাউন্সিল প্রবর্তন—১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম জেলাগুলিতে একটি করিয়া কাউন্সিল (District Council) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে ভারতসচিব, ভারত গভর্নমেণ্ট এবং প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, রাস্তা নির্মাণ এবং সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে এক বিশদ আলোচনা চলিতেছিল। এই সকল জনহিতকর কার্য করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের বিশেষ অভাব ছিল। ভারত গভর্নমেণ্ট প্রস্তাব করিলেন যে নূতন কর বসাইয়া এই সকল কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ভারতসচিব এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই মত প্রকাশ করিলেন যে, নূতন করগুলিকে সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় কররূপে ধরিয়া লইতে হইবে, কোন বিশেষ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ঐ করগুলি বসাইয়া অর্থসংগ্রহ করিবে এবং সেই অর্থ ঐ স্থানের উন্নতির জন্য ব্যয় করিবে। এই সময়

ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন **লর্ড মেয়ো**। তাঁহার গভর্নমেণ্ট ভারতসচিবের এই অভিমত প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলির নিকট প্রেরণ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সম্বন্ধে নিজেদের মতামতও জ্ঞাপন করিলেন। ভারত গভর্নমেণ্ট স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, রাস্তা নির্মাণ, শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি স্থানীয় কার্য সম্পাদন ব্যাপারে যোগদান করিবার জন্য সাধারণ লোকদিগকে সুযোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। স্বাস্থ্যোন্নতি, রাস্তা নির্ম্মাণ, শিক্ষাবিস্তার, জল সরবরাহ এইগুলি সমস্তই জনহিতকর কার্য। এই কার্যগুলির সুসম্পাদন প্রয়োজনীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবলমাত্র এই সুসম্পাদনের দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। যাহাতে এই সম্পাদন ব্যাপারে সাধারণের সংযোগ ও সহকারিতা থাকে সেদিকে বিশেষ করিয়া দৃষ্টি দিতে হইবে। ইহার পর বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদে জেলা পথকর বিল (District Road Cess Bill) আনয়ন করা হয় এবং ঐ বিল ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পাশ হইয়া আইনে পরিণত হয়। এই আইন অনুসারে প্রতি জেলায় রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার কার্যের জন্য একটি করিয়া কমিটি গঠিত হয়। কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য বেসরকারী ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতে মনোনীত করা হইত। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং কমিটির প্রেসিডেণ্ট এবং কর্মকর্তা হিসাবে নিযুক্ত হইতেন।



লর্ড মেয়ো

লর্ড রিপন ও জেলা বোর্ড স্থাপন, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের আইন—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে লর্ড রিপনের অভিমত এবং চেষ্টার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার গভর্নমেণ্ট যে প্রস্তাবপত্র প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলির নিকট পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে যে কেবল মিউনিসিপ্যালিটিগুলির উন্নতিসাধনের ব্যবস্থাই ছিল এমন নহে। বাস্তবিক পক্ষে উহাতে জেলা কাউন্সিলগুলির উন্নতির ব্যবস্থাও স্পষ্টভাবে করা হইয়াছিল। কাউন্সিলগুলির সভ্যদিগের কত অংশ নির্বাচিত হইবেন, সভাপতিগণ নির্বাচিত হইবেন অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-গণ সভাপতির পদে নিযুক্ত থাকিবেন, বোর্ডগুলি এক একটি জেলা কিংবা এক একটি মহকুমা লইয়া গঠিত হইবে ইত্যাদি বিষয়ে এখন হইতে নানা তর্কবিতর্ক এবং বাদানুবাদ চলিতে থাকিল। দীর্ঘ চারি বৎসর এই আলোচনা চলিবার পর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক আইন পাশ হইল। এই আইন ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে অনেক স্থলে পরিবর্তিত হইয়াছে। এই আইন অনুসারে প্রতি জেলায় একটি করিয়া জেলা বোর্ড এবং প্রতি মহকুমায় একটি করিয়া লোক্যাল বোর্ড স্থাপিত হইবার ব্যবস্থা হয়। লোক্যাল বোর্ডগুলির সভ্যদিগের দুই-তৃতীয়াংশ অধিকাংশ স্থলেই করদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন, অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ সভ্য গভর্নমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। লোক্যাল বোর্ডের সভাপতি এবং কর্মকর্তা বোর্ডের সভ্যদিগের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। লোক্যাল বোর্ডগুলির কর্তব্য জেলা বোর্ড নির্ধারিত করিয়া থাকে, এবং ঐ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহাও জেলা বোর্ডই প্রদান করিয়া থাকে। লোক্যাল বোর্ডের নিজস্ব কোনও তহবিল নাই এবং নিজের দায়িত্বে কোন অর্থ সংগ্রহ করিবার অধিকারও নাই। বর্তমানে জেলা বোর্ডগুলির সভ্য-

সংখ্যা ১৮ হইতে ৩৪ পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। হাওড়া, মালদহ, এবং বগুড়া জেলা বোর্ডগুলির বর্তমান সভ্যসংখ্যা ১৮। মেদিনীপুর বোর্ডের সভ্যসংখ্যা ৩৪। দুইটি ভিন্ন অন্যান্য সকল জেলা বোর্ডের সভ্য-সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ লোক্যাল বোর্ডের সভ্যদিগের দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকে। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ সভ্য গভর্নমেণ্টের মনোনীত। জেলা বোর্ডের সভাপতি এবং প্রধান কর্মকর্তা গভর্নমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হইতে পারেন কিংবা গভর্নমেণ্টের ইচ্ছা অনুসারে বোর্ডের সভ্যদিগের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইতেও পারেন। বর্তমানে দার্জিলিং ভিন্ন অন্যান্য সকল জেলাতেই জেলা বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট জেলা বোর্ডের সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। বোর্ডের কার্যতালিকার মধ্যে রাস্তানির্মাণ, শিক্ষাবিস্তার, সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা, জল সরবরাহের বন্দোবস্ত প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল কার্য সম্পাদনের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহা জমির উপর কর বসাইয়া, গভর্নমেণ্টের সাহায্য লইয়া, খেয়া প্রভৃতি ইজারা দিয়া এবং মোটর গাড়ির উপর ট্যাক্স বসাইয়া সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। বোর্ড-গুলির আয় অতি সামান্য। দার্জিলিং বোর্ডের বার্ষিক আয় দুইলক্ষ টাকার কিছু উপরে। এই বোর্ডটির আয় বাস্তবিক পক্ষে সর্বাপেক্ষা কম। মৈমনসিংহ বোর্ডের আয় প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা। এই বোর্ডের আয়ই সর্বাপেক্ষা বেশি। কিন্তু জেলার বিস্তৃতি এবং জনসংখ্যার তুলনায় ১৪ লক্ষ টাকা যথেষ্ট নহে।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধন আইন—কিছুদিন পূর্বে (১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইনের কোন কোন বিষয়ে পুনরায় পরিবর্তন করা হইয়াছে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের আইন অনুসারে লোক্যাল এবং জেলা বোর্ডের সভ্যগণ তিন বৎসরের জন্য মনোনীত অথবা নির্বাচিত

হইতেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই নিয়ম পরিবর্তন করিয়া তিন বৎসরের স্থলে চার বৎসর করা হইয়াছিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহাতে সভ্যগণ একযোগে পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত অথবা মনোনীত হইবেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহাও স্থির হইয়াছে যে জেলা বোর্ডের অনুমোদন লইয়া লোক্যাল বোর্ডগুলি তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। অনেকদিন হইতে লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে লোক্যাল বোর্ডগুলির অস্তিত্ব বজায় রাখা নিষ্প্রয়োজন। ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইবার পরে লোক্যাল বোর্ডগুলির বাস্তবিকপক্ষে করিবার মত কিছুই অবশিষ্ট থাকিত না। স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধীয় যাহা কিছু কাজ তাহা একদিকে জেলা বোর্ড ও অপরদিকে ইউনিয়ন বোর্ড-গুলি সম্পাদন করিতে পারে। সুতরাং লোক্যাল বোর্ড তুলিয়া দিলে কোন ক্ষতি হইবে না। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া বাংলা গভর্নমেণ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইনের পরিবর্তন করিয়াছেন।

চৌকিদারী-পঞ্চায়েত স্থাপন, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের আইন— ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চৌকিদারী আইন পাশ হয়। ইহার ফলে প্রতি গ্রামে এক একটি করিয়া পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পঞ্চায়েতের সভ্যগণ টাকা তুলিয়া চৌকিদারদিগের বেতনের বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন পাশ হইবার পূর্বে কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক একটি ইউনিয়ন কমিটি গঠন করিবার প্রস্তাব গভর্নমেণ্ট আনয়ন করেন এবং বাস্তবিকপক্ষে কতকগুলি ইউনিয়ন কমিটি এইভাবে গঠন করা হয়। সেই সময়ে গ্রামগুলির রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার প্রভৃতি কার্যের ভার এই কমিটিগুলির উপর দেওয়া হয়। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় একবার বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, গ্রাম্য পঞ্চায়েতগুলি তুলিয়া দিয়া তাহাদের

স্বতন্ত্র কাজের জন্য গভর্নমেণ্টের নিকট হইতেও সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। সাধারণ ইউনিয়ন বোর্ডগুলির আয় অতি সামান্য। অনেকগুলির সমুদয় বার্ষিক আয় বারশত টাকা অতিক্রম করে না। এই সামান্য আয়ের ৮।৯ শত টাকা চৌকিদারী কার্যে ব্যয় হইয়া থাকে। অবশিষ্ট সামান্য টাকা লইয়া রাস্তা, পুল প্রভৃতির নির্মাণ, স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি কার্য করিতে হয়। ইহাতে এই কর্তব্যগুলি কিরূপভাবে সম্পাদিত হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

রাষ্ট্রীয় পরিষদের (Council of State) সভ্যনির্ধারণ

নিম্নলিখিতভাবে ব্রিটিশ-ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও সম্প্রদায় হইতে রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হইবে

প্রদেশ অথবা সম্প্রদায়	সমুদয় সভ্যসংখ্যা	সাধারণ সভ্যগণ	অনুন্নত জাতি-বৃন্দের সভ্যসংখ্যা	শিখদিগের সভ্যসংখ্যা	মুসলমানদিগের সভ্যসংখ্যা	মহিলাদিগের সভ্যসংখ্যা
মাদ্রাজ	২০	১৪	১		৪	১
বোম্বাই	১৬	১০	১		৪	১
বাংলা	২০	৮	১		১০	১
যুক্তপ্রদেশ	২০	১১	১		৭	১
পঞ্জাব	১৬	৩	—	৪	৮	১
বিহার	১৬	১০	১		৪	১
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৮	৬	১		১	
আসাম	৫	৩	—		২	
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৫	১	—		৪	
উড়িষ্যা	৫	৪	—		[illegible]	
সিন্ধু	৫	২	—		৩	
ব্রিটিশ বেলুচিস্থান	১	—	—		১	
দিল্লী	১	১	—		—	
আজমীঢ়-মাড়ওয়াড়	১	১	—		—	
কুর্গ	১	১	—		—	
অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান	১	—	—		—	
ইউরোপীয়ান	৭	—	—		—	
ভারতীয় খ্রীষ্টান	২	—	—		—	
মোট	১৫০	৭৫	৬	৪	৪৯	৬

ফেডারেল্ সভা (Federal Assembly)

নিম্নলিখিতভাবে ব্রিটিশ-ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং সম্প্রদায় হইতে ফেডারেল্ সভার সভ্য নির্বাচিত হইবে

প্রদেশ	মোট সভ্য-সংখ্যা	মোট সাধারণ সভ্য-সংখ্যা	অনুন্নত শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত সাধারণ সভ্যসংখ্যা	শিখ সভ্য-সংখ্যা	মুসলমান সভ্য-সংখ্যা	অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সভ্য-সংখ্যা	ইউরোপীয় সভ্য-সংখ্যা	ভারতীয় খ্রীষ্টান সভ্য-সংখ্যা	বাণিজ্য ও শিল্পের সভ্য-সংখ্যা	জমিদার সভ্য-সংখ্যা	মজুরদের সভ্য-সংখ্যা	মহিলাদের সভ্যসংখ্যা
মাদ্রাজ	৩৭	১৯	৪	—	৮	১	১	২	২	১	১	২
বোম্বাই	৩০	১৩	২	—	৬	১	১	১	৩	১	২	২
বাংলা	৩৭	১০	৩	—	১৭	১	১	১	৩	১	২	১
যুক্তপ্রদেশ	৩৭	১৯	৩	—	১২	১	১	১	—	১	১	১
পঞ্জাব	৩০	৬	১	৬	১৪	—	১	১	—	১	—	১
বিহার	৩০	১৬	২	—	৯	—	১	১	—	১	১	১
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১৫	৯	২	—	৩	—	—	—	—	১	১	১
আসাম	১০	৪	১	—	৩	—	১	১	—	—	১	—
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৫	১	—	—	৪	—	—	—	—	—	—	—
উড়িষ্যা	৫	৪	১	—	১	—	—	—	—	—	—	—
সিন্ধু	৫	১	—	—	৩	—	১	—	—	—	—	—
ব্রিটিশ বেলুচিস্থান	১	—	—	—	১	—	—	—	—	—	—	—
দিল্লী	২	১	—	—	১	—	—	—	—	—	—	—
আজমীঢ়-মাড়ওয়াড়	১	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কুর্গ	১	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
অপ্রাদেশিক সভ্যসংখ্যা	৪	—	--	—	—	—	—	—	৩	—	১	—
মোট	২৫০	১০৫	১৯	৬	৮২	৪	৮	৮	১১	৭	১০	৯

গভর্নর-জেনারেল এবং প্রাদেশিক গভর্নরদিগের বেতনের হার

নিম্নলিখিত বার্ষিক বেতন গভর্নর-জেনারেল এবং গভর্নরদিগকে দেওয়া হইবে :—

১।	গভর্নর-জেনারেল	দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আট শত টাকা.
২।	মাদ্রাজের গভর্নর	এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা
৩।	বোম্বাইএর গভর্নর	"
৪।	বাংলার গভর্নর	"
৫।	যুক্তপ্রদেশের গভর্নর	"
৬।	পঞ্জাবের গভর্নর	এক লক্ষ টাকা
৭।	বিহারের গভর্নর	"
৮।	মধ্যপ্রদেশের গভর্নর	বাহাত্তর হাজার টাকা
৯।	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর	ছিয়াষট্টি হাজার টাকা
১০।	উড়িষ্যার গভর্নর	"
১১।	সিন্ধুর গভর্নর	"
১২।	আসামের গভর্নর	"

বিচারপতিদিগের (Judges of the Federal Court and High Courts) মাসিক বেতন

১।	ফেডারেল্ কোর্টের প্রধান বিচারপতি	সাত হাজার টাকা
২।	ফেডারেল্ কোর্টের সাধারণ বিচারপতি	পাঁচ হাজার পাঁচ শত "
৩।	কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি	ছয় হাজার "
৪।	অন্যান্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি	পাঁচ হাজার "
৫।	হাইকোর্টগুলির সাধারণ বিচারপতি	চারি হাজার "

বাংলার ব্যবস্থাপক সভার (Legislative Assembly) সভ্যসংখ্যার তালিকা

(মোট সভ্যসংখ্যা ২৫০)

সাধারণ সভ্যসংখ্যা তন্মধ্যে অনুন্নত শ্রেণীর সভ্যসংখ্যা ৩০	...	...	৭৮
মুসলমান সভ্যসংখ্যা	...	...	১১৭
অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সভ্যসংখ্যা	...	...	৩
ইউরোপীয়ান সভ্যসংখ্যা	...	...	১১
ভারতীয় খ্রীষ্টান সভ্যসংখ্যা	...	...	২
শিল্প ও বাণিজ্যের সভ্যসংখ্যা	...	...	১৯
জমিদারদিগের সভ্যসংখ্যা	...	...	৫
বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যসংখ্যা	...	...	২
মজুরদিগের সভ্যসংখ্যা	...	...	৮
হিন্দু (সাধারণ) মহিলাদিগের সভ্যসংখ্যা		...	২
মুসলমান " "		...	২
অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান " "		...	১
		মোট	২৫০

বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের (Legislative Council) সভ্যসংখ্যার তালিকা

(মোট সভ্যসংখ্যা ৬৩এর কম নয়, ৬৫এর বেশি নয়)

সাধারণ সভ্যসংখ্যা … … …	১০
মুসলমান " … … …	৭
ইউরোপীয়ান " … … …	৩
ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক নির্বাচিত সভ্যসংখ্যা … …	১৭
গভর্নর কর্তৃক মনোনীত সভ্যসংখ্যা	৬এর কম নয়, ৮এর বেশি নয়